

হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর কারা হামলা করে  
 সাম্প্রতিক কালে নড়াইলসহ বাংলাদেশের কিছু জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর কয়েকটি আক্রমণের  
 খবর এসেছে। সাম্প্রদায়িকতা দেশের বাম প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বদরুন্দীন উমরের দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ  
 ও পর্যালোচনার বিষয়। পাকিস্তান শাসনামলে প্রকাশিত সাম্প্রদায়িকতা তাঁর বহুল আলোচিত একটি  
 গ্রন্থ। পরেও বিষয়টি নিয়ে তিনি লিখেছেন। বর্তমান লেখাটি সে ধারাবাহিকতারই অংশ। বিষয়টি  
 নিয়ে প্রথম আলো আরও পর্যালোচনামূলক লেখা প্রকাশে আগ্রহী।

লেখা: বদরুন্দীন উমর



### বদরুন্দীন উমর

কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের কিছু জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।  
 এর মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা হলো ১৫ জুলাই ২০২২ তারিখে নড়াইল জেলার লোহাগড়ার সাহাপাড়া  
 গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়ি, মন্দির, দোকানপাটের ওপর আক্রমণ, ভাঙ্গুর,  
 অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদি। এ ধরনের আক্রমণের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বলা হয়, ফেসবুকে কোনো  
 হিন্দু ব্যক্তির ইসলামবিরোধী বক্তব্যে ‘ধর্মপ্রাণ’ মুসলমানদের ‘ধর্মীয় অনুভূতি’তে আঘাত লেগেছিল।  
 কোনো হিন্দু ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে কেন ও কী কারণে হঠাতে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিশোদ্ধার করবে, তার  
 ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ফেসবুকে এ রকম কোনো আদৌ লেখা হয়েছে, সেটা  
 যাচাই করে দেখার ঘটনা ঘটে না।

এ পর্যন্ত এ ধরনের ফেসবুক ব্যবহারকারীদের কাউকেও কেউ পাগল হিসেবে শনাক্ত করেনি। সে অনুযায়ী বলা যায়, ফেসবুক ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা মানসিকভাবে সুস্থ। সামান্য হলেও শিক্ষাদীক্ষা থাকা মানসিকভাবে সুস্থ একজন হিন্দু ব্যক্তি কি জানে না যে ফেসবুকে ইসলামের বিরুদ্ধে কটুতি করলে তার এলাকার মুসলমানদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে? তার নিজের কী বিপদ ঘটতে পারে? সে কি এ আশঙ্কার কথা একবারও না ভেবে নিশ্চিন্তে ইসলামের বিরুদ্ধে এভাবে কটুতি করতে পারে?

এটা বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যাপার নয়। দেখা যায় যে একটা এলাকায় হঠাতে ফেসবুকে কোনো হিন্দু ব্যক্তির ইসলামবিরোধী বক্তব্যের কথা বলে স্থানীয় কিছু মুসলমান আওয়াজ তোলে, হইচই শুরু হয়, কিন্তু তার সত্যাসত্য যাচাইয়েরই কোনো প্রয়োজন কারও হয় না।



নড়াইলের লোহাগড়ার সাহাপাড়ায় মেরামত করা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত গোবিন্দ সাহার বাড়ি। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেনফাইল ছবি এ পরিস্থিতিতে স্থানীয় কিছু ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী লোক মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার কথা বলে লোকজন জড়ো করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করে। তাদের বাড়িঘর, মন্দির, দোকান লুটপাট করে এবং জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের ঘরছাড়া করে। চেষ্টা করে তাদের সম্পত্তি দখল করতে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের কারণে ঘটনাগুলোকে আপাতদৃষ্টি সাম্প্রদায়িক বলে মনে হলেও এগুলোকে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে লুটপাটের যে রাজত্ব শুরু হয়ে ৫০ বছর ধরে চলে আসছে, এগুলো সেই রকমেরই ব্যাপার। বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত এবং সচেতন, তাঁরা জানেন, শাসকশ্রেণির অন্তর্গত এবং তাদের বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু লোক জাতিধর্ম-নির্বিশেষে অবাধে এবং কোনো শাস্তির ভয়ে ভীত না হয়ে হিন্দু, সাঁওতাল, গাঁরো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি গোষ্ঠীর জমিজমা, সম্পত্তি, বাড়িঘর লুটপাট করে আসছে। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরও যে ছাড় দেওয়া হয়, তেমন নয়।

মুসলমানরাও যেখানে দুর্বল, সেখানে তাদেরও জমিজমা, ধনসম্পত্তির ওপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবেদন প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায়। কারণ, যারা লুঠনকারী ও লুঠনজীবী, তাদের কাছে জাতি বা ধর্ম ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক। যাদের সম্পত্তি লুটপাটের আশঙ্কা থাকে, যারা দুর্বল, তাদের সম্পত্তি এরা লুটপাট করে। বাংলাদেশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে না তাকিয়ে, তার হিসাব না করে উপরোক্ত ধরনের ঘটনাকে সাধারণভাবে লুঠনজীবীদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ না ভেবে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ মনে করা বড় রকমের ভ্রান্তি।

বলা হয়েছে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যেভাবে আক্রমণ হচ্ছে, সে ধরনের আক্রমণ অন্যদের ওপরও হচ্ছে। কাজেই এসব আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক বলার আগে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিরাজ করে কি না, সেটা দেখা দরকার। কারণ, একটি দেশে যদি সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিরাজ না করে, তাহলে উপরোক্ত ধরনের লুঠনজীবীদের আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক বলা হবে সত্যের বড় রকম অপলাপ। বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতির দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে যদি কেউ সাম্প্রদায়িক বলেন, তাহলে সেটা এ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে বড় রকম অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু হবে না।



দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর হামলার ঘটনায় শাহবাগে প্রতিবাদ প্রথম আলো ফাইল ছবি

মনে রাখা দরকার, সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশ আমলের উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম লাভ করা এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বিশ শতকের প্রথম থেকে পুরোপুরি রাজনৈতিক চরিত্র পরিগ্রহ করে। এ কারণে সাম্প্রদায়িকতা কোনো প্রকৃত ধর্মীয় ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে ধর্মচর্চার কোনো সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িক লোকেরা যে ধার্মিক তা বলা যাবে না। এটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের ঐহিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে উত্তৃত। ব্রিটিশ ভারতে এ দ্বন্দ্ব থেকেই জন্মলাভ করেছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু আধিপত্যের অবসানের পর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে তার বড় ধরনের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এ প্রক্রিয়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটা পরিণতি লাভ করে। বাংলাদেশ কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। এটি বাঙালিদের রাষ্ট্র, যার একাংশ হিন্দু। বাঙালিদের এ রাষ্ট্রে মুসলমানদের মতো হিন্দুরাও, ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, শাসকশ্রেণির লোক। উর্দুভাষী মুসলমান, পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি এবং সাঁওতাল, মুঙ্গা, গাঁরো, হাজং ইত্যাদি সম্পর্কে এটা বলা যাবে না। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের অংশ এ হারের চেয়ে বেশি। সরকারি আমলা, পুলিশ,

র্যাব, সামরিক বাহিনী, শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপস্থিতি ভালো থাকলেও পাহাড়িদের ছিটেফোঁটা উপস্থিতি ছাড়া অন্য সংখ্যালঘুদের দেখা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা থাকলে হিন্দুদের এমন অবস্থা কি সম্ভব হতো? এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ।



কুমিল্লার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও বাড়িস্থে হামলা হয়েছেফাইল ছবি: প্রথম আলো

কিন্তু তাদের চাকরি ২ শতাংশের বেশি নয়। লক্ষ করার বিষয়, মুসলমানদের এ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঘরবাড়ি, জমিজমা ও জীবনের ওপর সেখানে হামলা নেই। কারণ, সেখানকার শাসকশ্রেণি বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির মতো লুঠনজীবী নয়। তারা হলো সুগঠিত বুর্জোয়া শ্রেণি। তারা শোষক হলেও চরিত্রগত কারণে অন্যদের ওপর হামলা করে না, যে ধরনের হামলা লুঠনজীবীদের দ্বারা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ভারতের মতো বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি সাম্প্রদায়িক নয়। এ জন্য বাংলাদেশে মুসলিম লীগের মতো কোনো সাম্প্রদায়িক দল নেই। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক নয়। তারা ইসলামি মৌলবাদী, দেশে কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে শাসন প্রতিষ্ঠাই তাদের ঘোষিত লক্ষ্য। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কিছু বলে না। তারা গণতন্ত্র, সাম্যবাদ ইত্যাদি সব ধরনের প্রগতির শক্ত। তাদের শক্ত হিন্দু সম্প্রদায় নয়, তাদের শক্ত কমিউনিস্ট, গণতন্ত্রী এবং যেকোনো ধরনের প্রগতিবাদীরা।

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এ জন্য একটি দেশে সাম্প্রদায়িকতা থাকলে সেখানে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকতেই হবে। ভারত তার এক বড় উদাহরণ।

ভারতের শাসকশ্রেণি ভয়াবহভাবে সাম্প্রদায়িক। এ কারণে সেখানে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, শিবসেনার মতো বৃহৎ, শক্তিশালী ও বিপজ্জনক রাজনৈতিক দল।

বাংলাদেশের সমাজভূমিতে সাম্প্রদায়িকতার বাস্তব শর্ত অপসারিত হয়েছে। এ জন্য ব্যাপক জনগণের মধ্যে আগের মতো সাম্প্রদায়িকতা নেই। একই কারণে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি ও সাম্প্রদায়িক নয়। বাংলাদেশ ধর্মের ধর্জাধারীদের রাষ্ট্র নয়। বাংলাদেশ হলো ব্যবসায়ী বুর্জোয়া-শাসিত লুঠনজীবীদের রাষ্ট্র। এই লুঠনজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষ। এরা দেশজুড়ে দুর্বল সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের জমিজমা, বাড়িঘরসহ সব রকম সম্পত্তি লুটপাট করছে। পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণ ও সাঁওতাল, গারো, হাজং, মুসলমান অবাঙালি ইত্যাদি সমতলভূমির সংখ্যালঘু লোকদের ওপর এরা নিয়মিত হামলা চালায়।

তবে সেসব নিয়ে কম খবরই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া তা নিয়ে কোনো হইচই হয় না, যেমনটা হয় হিন্দু সম্পদায়ের ওপর কোনো আক্রমণ হলে। কারণ, হিন্দুদের আছে ভারত রাষ্ট্র। তা ছাড়া ভারতীয় জনগণের না হলেও বাংলাদেশে ভারত রাষ্ট্রের এবং তার সরকারের বন্ধুর কোনো অভাব নেই। এ কারণে অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হলে তাকে ‘সাম্প্রদায়িক হামলা’ বলে তার বিরুদ্ধে কোনো হইচই না হলেও, হিন্দু সম্পদায়ের ওপর আক্রমণ হলে বিবৃতি, সভা-সমিতি, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে সেটা হয়ে থাকে।

কিছু বুদ্ধিজীবী তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে উচ্চকণ্ঠ হন। অন্যদিকে লক্ষ করার বিষয়, দেশে জনগণের ওপর সামগ্রিকভাবে যে নির্যাতন চলে, তাদের ওপর যে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, দেশে হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে গরিবদের ওপর যে শোষণ চলে, সেটার বিরুদ্ধে তাঁদের দাঁড়াতে দেখা যায় না। ২০১৪ সালের ১৪ জুন ঢাকার মিরপুরে পুলিশের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সংসদ সদস্য জমি দখলের উদ্দেশ্যে তাঁর লোকজনকে দিয়ে বিহারিদের বন্তি আক্রমণ করে আগুন দিয়েছিলেন। এতে এক পরিবারের ১০ জন পুড়ে মারা যায়। সে সময় এই উচ্চকণ্ঠ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের তাঁর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে বা কোনো রকম প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি।

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে রাজনীতি ও তপ্তোতভাবে সম্পর্কিত। এ জন্য একটি দেশে সাম্প্রদায়িকতা থাকলে সেখানে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকতেই হবে। ভারত তার এক বড় উদাহরণ। ভারতের শাসকশ্রেণি ভয়াবহভাবে সাম্প্রদায়িক। এ কারণে সেখানে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, শিবসেনার মতো বৃহৎ, শক্তিশালী ও বিপজ্জনক রাজনৈতিক দল।

বাংলাদেশে অবাঙালি সংখ্যালঘুদের ওপর যে আক্রমণ ও নির্যাতন হচ্ছে, তার তুলনায় হিন্দু সম্পদায়ের ওপর আক্রমণের পরিমাণ অনেক কম। অবশ্য পরিমাণ কম হলেও স্থানীয় লুঠনজীবীরা যেখানেই সুযোগ পায়, সেখানেই গরিব ও অসহায় হিন্দুদের ওপর নানা অসিলায় আক্রমণ করে, তাদের জমিজমা, ঘরবাড়ি, সম্পত্তি লুটপাট করে। এটা তারা কোনো ধর্মীয় কারণে করে না, যদিও আজকাল ফেসবুকে গল্প তৈরি করে এগুলোকে ধর্মীয় চরিত্র দেওয়ার চেষ্টা হয়ে থাকে।

‘ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত’ লাগার কথা বলে যারা হিন্দু সম্পদায়ের ওপর এভাবে আক্রমণ করে, তাদের দিকে তাকালেই দেখা যাবে ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তারা ধর্মীয় জীবন যাপন করে না, তারা মূলত স্থানীয় লুঠনকারী ও দুর্নীতিবাজ। ফেসবুক হয়ে দাঁড়িয়েছে বিগত ১৯৯০-এর দশক থেকে জেলহাজতে হার্টফেল বা রাস্তায় র্যাব-পুলিশের ক্রসফায়ার ইত্যাদির মতো ব্যাপারে। ফেসবুকের ব্যাপারটি সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ, এখানে নির্থ্যার মাধ্যমে জনগণের একটা অংশকে বিভাগ করে হিন্দু সম্পদায়ের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা যায়।

বাংলাদেশে শাসকশ্রেণির মুসলমান বাঙালিদের প্রধান অংশ মনে করে, গরিব শ্রমজীবী মুসলমানদের ওপর যে শোষণ-নির্যাতন চলছে, তার দিকে চোখ বুজে থাকা সম্ভব নয়; তেমনই শাসকশ্রেণির হিন্দু বাঙালি অংশ মনে করে, তাদের ওপর যে আক্রমণ ও হামলা মাঝেমধ্যে হচ্ছে, তার দিকেও চোখ বুজে থাকা যায় না। তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদের নামে এক দল বুদ্ধিজীবী এ ধরনের ঘটনাকে প্রায়ই যেভাবে উপস্থিত করে থাকেন, তা চরম বিভাগিকর। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সম্পদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধে তা কোনো পথ নয়। উপরন্ত এর দ্বারা এক কল্পিত শক্তিকে সামনে খাড়া করে আসল শক্তি ও অপরাধীদের আড়াল করা হয়; সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিরই চেষ্টা হয়। তাঁরা যেভাবে এ কাজ করেন, তাতে মনে হয় এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা মাঠে নামার অপেক্ষায় থাকেন। দেশে অন্য বহু ব্যক্তি বা সংস্থা এর বিরুদ্ধে যেভাবে দাঁড়ায়, তার মধ্যে অবশ্য আন্তরিকতা ও গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব থাকে না। সৎ প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তাদের মধ্যে এটা দেখা যায়।

সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতার নামে যে বুদ্ধিজীবীদের কথা ওপরে বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন একধরনের ‘উচ্চকষ্ট অসাম্প্রদায়িক’ গোষ্ঠী। হিন্দু সম্পদায়ের ওপর কোনো আক্রমণের ঘটনা ঘটলেই তাঁরা এর কারণ অনুসন্ধানের মধ্যে না গিয়ে এমন সব বক্তব্য দিতে থাকেন, যা আসল দুষ্কৃতকারীদের চোখের আড়াল করে। এসব আক্রমণ ও হামলার ঘটনা যে শাসকশ্রেণি ও শাসক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তাদেরই স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা সংঘটিত-সে বিষয়টি থেকে মানুষের চোখ ফিরিয়ে দিতেই তাঁরা চেষ্টা করেন।

এ উচ্চকষ্ট অসাম্প্রদায়িকদের একটি বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। তাঁরা হিন্দু গরিবদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটলেই বলতে থাকেন এবং সম্প্রতি নড়াইলে যে ঘটনা ঘটেছে, তারপরও বলে চলেছেন যে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হতে চলেছে! এ ধরনের আজগুবি বক্তব্য যে হিন্দু সম্পদায়ের ওপর আক্রমণকারীদের প্রকৃত চরিত্র আড়াল করারই এক চক্রান্ত, তাতে সন্দেহ নেই। আফগানিস্তানে সেখানকার শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে যা করছে, তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই। শিয়াদের ওপর যে আক্রমণ হচ্ছে, সেটা করছে ইসলামিক স্টেট বা আইএসের লোকেরা। তার সঙ্গে আফগানিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কোনো সম্পর্ক নেই। এ শাসকগোষ্ঠী কট্টর ইসলামি মৌলবাদী। তাদের উদ্দেশ্য ইসলামের নামে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুন বলবৎ রাখা, বিশেষ করে নারীদের ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাদের শিক্ষা ও কর্মহীন অবস্থায় গৃহবন্দী করে রাখা।

বাংলাদেশের শাসক দল এ রকম কিছু করছে না। তারা বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলে শিরোধার্য করে রাখলেও বাস্তবত তারা কোনো ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে না। আফগানিস্তানের তালেবানের মতো তারা নারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আনছে না অথবা তাদের ওপর কোনো আক্রমণ করছে না। নারীরা এখানে অনেকটা পরিমাণে স্বাধীন। তাদের জন্য শিক্ষা ও কাজের দরজা খোলা আছে। কাজেই বাংলাদেশে মাঝেমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে হামলা হচ্ছে তাকে যাঁরা তালেবানের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করছেন এবং ‘বাংলাদেশ আফগানিস্তানে পরিণত হতে চলেছে’ বলে আওয়াজ তুলছেন, তাঁরা চরম অজ্ঞ। তাঁরা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না অথবা দুরভিসম্ভির বশবর্তী হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আফগানিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতির তুলনা করছেন। এ উচ্চকষ্ট অসাম্প্রদায়িকেরা সবাই শিক্ষিত বলে তাঁরা আফগানিস্তানের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত তা বলা যাবে না।

তাঁরা হিন্দু গরিবদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটলেই বলতে থাকেন এবং সম্প্রতি নড়াইলে যে ঘটনা ঘটেছে, তারপরও বলে চলেছেন যে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হতে চলেছে! এ ধরনের আজগুবি বক্তব্য যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণকারীদের প্রকৃত চরিত্র আড়াল করারই এক চক্রান্ত, তাতে সন্দেহ নেই।

ফলে বলতে হয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণকারীদের চরিত্র ও পরিচয় আড়াল করার জন্য তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এ কাজ করছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যত জায়গায় এ পর্যন্ত আক্রমণ হয়ে আসছে, দেখা যাবে সেখানে আক্রমণকারীরা স্থানীয় প্রভাবশালী এবং সরকারি দল বা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্থানীয়ভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং জমি দখল ও লুটপাটের উদ্দেশ্যেই তারা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বসতি, মন্দির, দোকানপাট ইত্যাদির ওপর আক্রমণ করে।

সম্প্রতি নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার সাহাপাড়া গ্রামে ১১টি ঘর, ৫টি মন্দির ও ২০টি দোকান আক্রমণ করে তারা লাখ লাখ টাকা ও সম্পদ লুটপাট করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য এ সংখ্যা অনেক কম করে দেখানো হয়েছে। এর কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ করার মতো তা হলো বিভিন্ন সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর এ ধরনের আক্রমণ হলেও আক্রমণকারীদের ঠিকমতো চিহ্নিত করে তাদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা কোনো সময়েই হয় না।

উপরোক্ত উচ্চকষ্ট অসাম্প্রদায়িকেরা এর কারণ সম্পর্কে কিছু বলেন না। সরকার যে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না, তাদের গ্রেপ্তার করা হয় না, ক্ষেত্রবিশেষে গ্রেপ্তার করলেও কয়েক দিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়, শাস্তি দেওয়া হয় না—এসব নিয়ে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আগেই বলা হয়েছে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে ধরনের আক্রমণ করা হয়ে থাকে, সে ধরনের আক্রমণ সাঁওতাল, গাঁরো, হাজং এবং চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, উরুভাষী মুসলমানদের ওপরেও করা হয়, কিন্তু সেসব আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক বলা হয় না, তা নিয়ে কাউকে তৎপরও হতে দেখা যায় না। এর সহজ কারণ উচ্চকষ্ট সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধীরা ভারতের দিকে তাকিয়েই হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে।

একই ধরনের আক্রমণ অন্যান্য সংখ্যালঘু এবং অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটলেও তাঁদের খবর থাকে না। জনগণের ওপর শাসক দল ও সরকারের নানা নির্যাতনের বিরুদ্ধেও তাঁদের সোচার হতে দেখা যায় না। দল বেঁধে তাঁরা এ নিয়ে সংবাদপত্রে কোনো বিবৃতি দেন না, প্রতিবাদ সভা করেন না।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণকে সাম্প্রদায়িকতা আখ্যা দিয়ে যেভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে, সেটা যে ভারতের ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক দল বিজেপির কাছে আদরণীয়, তা বলাই বাহ্যিক। যাঁরা এ প্রচারকাজ করেন, তাঁরাও তাদের কাছে আদরণীয়। এসব আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে ভারতে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতা আছে, বাংলাদেশেও ঠিক সেভাবেই আছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ভারতকে বিশেষভাবে দোষী সাব্যস্ত করার কারণ নেই।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব আক্রমণের ঘটনা ঘটে এবং সম্প্রতি নড়াইলে যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে এত বিস্তারিতভাবে এখানে লেখার কারণ স্পষ্টভাবে দেখানো যে এসব হামলার কোনো প্রকৃত সাম্প্রদায়িক চরিত্র নেই। এ আক্রমণ সব ক্ষেত্রেই ঘটছে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির সঙ্গে সম্পর্কিত লুঠনজীবীদের দ্বারা, যারা প্রধানত সরকারি দল ও সরকারের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে সম্পর্কিত। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ঘটনাগুলো ঘটছে পুলিশের নাকের ডগায়।

পুলিশ সব সময়ই এসব আক্রমণের ফলে ক্ষয়ক্ষতি কম করে দেখানোর চেষ্টা করে, আসল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে না, গ্রেপ্তার করলেও কয়েক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেয়। কাজেই হিন্দুসহ অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর তারা নির্ভয়ে আক্রমণ করে চলে। অপরাধের শাস্তি নেই বলে দুষ্কৃতকারীরা সুযোগ পেলেই হিন্দু, সাঁওতাল, চাকমা, উরুভাষী মুসলমানদের জমিজমা, ঘরবাড়ি, সম্পত্তি আক্রমণ ও লুটপাট করে।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পাকিস্তান সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ‘শক্ত সম্পত্তি আইন’ করে তাদের সম্পত্তি লুটপাটের ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশের ধর্মবিযুক্ত (সেকুলার) রাষ্ট্রের সরকার সে আইন বাতিল না করে তার নাম পরিবর্তন করে রেখেছিল ‘অর্পিত সম্পত্তি আইন’। এ আইনের আওতায় তখন থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় লোকেরা দুর্বল হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে তাদের জমিজমা, বাড়িঘর, সম্পত্তি লুটপাট ও দখল করে আসছে। এ লুটপাট থেকে পরবর্তীকালে এবং এখন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যেভাবে আক্রমণ এবং তাদের সম্পত্তি লুটপাট হচ্ছে, তাকে আলাদাভাবে দেখা অবাস্তব ব্যাপার। ১৯৭২ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখলের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও তাদের ওপর আক্রমণ চলছে। এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই।

# হিন্দু বিতাড়নে বাংলাদেশে সব সরকারে ঐক্য প্রবল: সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত

১১ নভেম্বর ২০১৬



| আওয়ামী লীগ নেতা ও আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, বাংলাদেশে যে ধরণের সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, সবার মধ্যেই সংখ্যালঘুদের বিতাড়নে ঐক্যবদ্ধ মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।

বৃহস্পতিবার রাতে চ্যানেল আইটে প্রচারিত বিবিসি বাংলার প্রবাহ টেলিভিশন অনুষ্ঠান তিনি বলেন, "একটা মজার ব্যাপার হলো - সাম্প্রদায়িক, অসাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদী কিংবা উগ্র-সাম্প্রদায়িক যে সরকারই থাকুক না কেন, হিন্দু বিতাড়নে বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিতাড়নে এখানে একটা প্রবল ঐকমত্য আছে।"

হিন্দু-বৌদ্ধ-ধ্বিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০১ সাল পরবর্তী ১৩ বছরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্বাতনের ঘটনা ঘটেছে ২০,০০০-এর বেশি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য বলছে, ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের বাড়ি-ঘর-মন্দির ও পূজা মণ্ডপে ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছিল ২,৫০০-এর বেশি। আর চলতি বছর অট্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, বর্তমানে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কোন সুব্রহ্মণ্য তদন্ত-প্রমাণ না করেই হামলা চালানো হচ্ছে।



| ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাম্প্রতিক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় হিন্দুদের অনেক ঘর-বাড়ি ও মন্দির

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা মনে করছেন অতীতে হামলার বিভিন্ন ঘটনার বিচার না হওয়ায় এসব হামলা থামছে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এ জন্য আলাদা আইনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হচ্ছে।

তবে অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান মি. সেনগুপ্ত মনে করেন যে আইনের সমস্যা নয়, বরং এখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মানসিকতার বিষয়গুলো জড়িত।

"অসাম্প্রদায়িকতা এমন একটা জিনিস, যা আইন করে কাউকে শেখানো যাবে না।"

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমে আসছে এ কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, "আমি তো ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি"।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও পাবনা সহ দেশের বেশ কিছু স্থানে হিন্দুদের ওপর হামলা-ভাংচুরের ঘটনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্যবস্থা নিতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

"প্রধানমন্ত্রী, যার জন্যে আমরা এখন অপেক্ষা করছি, সাম্প্রতিক পাবনা থেকে শুরু করে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেই সম্পর্কে তাকে অবশ্যই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে"।

রাজনৈতিক দলগুলো পারস্পরিক দোষারোপের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে না আসলে এসব বিভেদ-বিভাজন আরও বাড়বে বলেও মি. সেনগুপ্ত আশংকা করেন।

## বাংলি সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া সবকিছুই কি সার্বজনীন বাংলি সংস্কৃতি??

১৪ ই এপ্রিল, ২০১২ সকাল ১১:৪৬

বাংলাদেশে শত শত বছর ধরে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান করছে, কিন্তু কখনই তারা নিজদের স্বকীয়তা ভুলে যায় নি কিংবা এক জনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অপরের উপর চাপিয়ে দিতে চায় নি। উভয় ধর্মের মানুষের মাঝে এমন কিছু বিশ্বাস আছে যা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক, তাই একজন মুসলমানের পক্ষে যেমন হিন্দুদের সব জীবনাচার একজন মুসলিম নিজ জীবনে সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিতে পারে না। এমন কিছু বিষয় আছে যা ইসলামে নিষিদ্ধ, যা হিন্দুদের কাছে পরম আরধ্য, ইসলামে অনেক কিছু নিন্দিনীয় তাই আবার হিন্দুদের কাছে প্রশংসনীয়, ইসলামে যাকে বলা হয় অশ্রীল তা করে হয়তো হিন্দুরা হয় সুশীল। এই বিশ্বাস ও জীবনাচারে পার্থক্য থাকার পরেও ইসলাম তাদের বিশ্বাস ও জীবনাচারে কখনোই বাঁধা দেয় না। শুধু যারা ইসলামে বিশ্বাসী তাদের এসব থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ দেয়। তাই দেখা যায় ইসলাম হিন্দুদের পূজা-পার্বণ পালন করতে বাঁধা দেয় না, কিন্তু মুসলমানদের সেখানে উপস্থিত হতে কঠিনভাবে নিষেধ করে। তাই মুসলমানরা তাদের সাথে সহাবস্থান করলেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধকে ভুলে যায় নি, আর তাতে কোন সমস্যাও সৃষ্টি হয়নি এত কাল। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম নামধারী কিছু সুশীল হিন্দুদের সব জীবনাচারকেই বাংলি সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিতে চায়, এবং তা পালন করার জন্য তাগিদ দেয়।

কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো মুসলমানদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং তা শিরকের দিকে নিয়ে যায় এগুলো মুসলমানদের পক্ষে কখনোই পালন করা সম্ভব না, এখন যে সব নামধারী মুসলিম এগুলো পালন করতে চায় এগুলো তাদের নিজস্ব সুবিধার ব্যাপার, কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের সকল মুসলিমকে তা পালনে উৎসাহী করতে চাইলে অবশ্যই সেখানে প্রতিবাদ করা উচিত। যেমন ধরুন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর ব্যাপারটি, তা আজ অনেক সুশীল মুসলিমকেই তা সচরাচর করতে দেখা যায়, কিন্তু মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো বাংলাদেশী মুসলমানদের কখনো সংস্কৃতি হতে পারে না, কারণ তা হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর তার ইতিহাস হলো-

"ভগবান বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলশী দেবীর সাথে ব্যভিচার করার ফলে তুলশী দেবীর অভিশাপে বিষ্ণু গোলাকার পাথরে পরিণত হয়ে গেলেন। শালগ্রাম নামক স্থানে এই ঘটনাটি ঘটেছিল বলে এই পাথরটির নামকরণ করা হয় শালগ্রাম শিলা।"

কিন্তু পাথরে পরিণত হওয়ার পর দেবতাদের ভয়ে তুলশীদেবী গাছ হয়ে সেই পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে যান। তখন দেবতাদের হুকুম হলো পূজার সময় প্রতিদিন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই শীলার বুকে ও পিঠে তুলশি পাতা সংযুক্ত করতে হবে, অন্যথায় ভগবান বিষ্ণুর পূজাই সিদ্ধ হবে না।"

এ উপমহাদেশে বিশেষকরে বাংলাদেশে মুসলমান এবং হিন্দুরা পাশাপাশি অবস্থান করলেও তারা কখনো তাদের নিজ সংস্কৃতিকে অপরের সাথে গুলিয়ে ফেলেনি। ইংরেজ লেখক স্যার জন মার্শাল এদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

"মানবেতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি যে, দুটি বিপরীতধর্মী সংস্কৃতি এরপ বিরাট পার্থক্য ও বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও পাশাপাশি অবস্থান করেছে অথচ একটি অপরটিকে গ্রাস করতে পারেনি।"

এ দুটি হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলমান সংস্কৃতি। তাদের মধ্যে বিপরীত মেরুর ব্যবধান, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে বিরাট পার্থক্য থাকায় পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তবুও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি। (*An advanced history of India*)

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ইংরেজরা আসার পর। হঠাৎ করেই তখন হিন্দু সংস্কৃতিকে সার্বজনীন করার জন্য ব্রিটিশরা চেষ্টা করল, কারণ হিন্দুরা ছিল তাদের অনুগামী এবং সাহায্যকারী, আর এ পথে আরো অগ্রসর হলেন হিন্দু সাহিত্যিকরা, যারা নিজেদের সাহিত্যের মাধ্যমে ব্রিটিশদের দালালী অনেক অগ্রগামী ছিল। আর মুসলমানরা শুরু থেকেই ব্রিটিশদের বিরোধী, তাই প্রয়োজন ছিল তাদের নিজ সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখা, তা সম্ভব না হলেও অন্তত হিন্দু সংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়া। ভারতীয় হিন্দুকে যেমন একেবারেই অ-ইসলামীকরণ করা হয়েছিল, তেমনি ভারতীয় মুসলমানকে হিন্দুয়ানী করার প্রচেষ্টা তখন চালানো হয়েছিল, তা নিরদ চৌধুরীর মন্তব্যে সেই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নিরদ সি, চৌধুরী তার 'কালান্তর সমস্যায়' লিখেছেনঃ

"ব্রিটিশ শাসন ইসলামী কালচার চর্চা করার কিংবা হিন্দুদের সহানুভূতি মুসলমানের প্রতি আকৃষ্ট করার বিরুদ্ধে ছিল। আর এই পরিস্থিতিতে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আবিষ্কার কর্মটা জোরদার করা হয়েছিল। এই রেনেসাঁর প্রথম ফল হয়েছিল ভারতীয় হিন্দুকে একেবারেই অ-ইসলামীকরণ ও হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন।"

হান্টারের মন্তব্য দেখেও সে কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে বলেছেন-

"কিন্তু নিম্নবর্গের মুসলমানগণ কিছুকাল থেকে এমনিভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে চলে গেছে যে, তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনগুলিই ধীরে ধীরে উপেক্ষা কয়া হয়েছে। ..... যেখানে পালা-পার্বণে খৃষ্টানদের বাষ্পত্রি দিন ও হিন্দুদেরকে বায়ান দিন ছুটি দেয়া হয়, সেখানে মুসলমানদের ছুটি দেয়া হয় মাত্র এগার দিন।..... সর্বোচ্চ সরকার শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন এবং মুসলমানী পর্যগুলোর জন্য কয়েক-দিনমাত্র ছুটি নির্দিষ্ট করে দেন। এ ছুটিগুলি অবশ্য মুসলমানগণ যতদিন চেয়েছিল ততদিন না হয়ে সরকারী কাজ-কর্মের সুবিধানুযায়ী যতদিন সম্ভব ততদিনই নির্দিষ্ট হয়েছিল"

ইংরেজদের আসার পর সেই যে শুরু হলো, আর আজকে তা এসে আমাদের ঐতিহ্যের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে। ইংরেজ-পূর্ব-যুগের যে সংস্কৃতি আঁকড়ে থাকতে গিয়ে আমরা বঞ্চিত হয়েছিলাম, আজ আমরা সেই ঐতিহ্যের ভুলে গেছি। যে সংস্কৃতি গ্রহণ করিনি বলে একসময় আমরা লাঞ্ছিত হয়েছিলাম আজ অনেক দেরিতে তাকেই ঐতিহ্য বলে সগর্বে প্রচার করছি এবং ইংরেজ-পূর্ব যুগকে যারা ঐতিহ্য হিসাবে প্রচার করতে চায় তাদের মধ্যে আমরা দালালের গন্ধ অনুসন্ধান করি।

মাওসেতুং তার 'নিউ ডেমোক্রেসী' গ্রন্থে বলেছেনঃ "আমাদের অতীতকে আমরা শুন্দা করি এবং ইতিহাসকেও আমরা কখনো অঙ্গীকার করব না।" আমাদের এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত। কারণ, ইতিহাস অঙ্গীকার করে কোন জাতি স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারে না, তারা পরিণত হয় এক জারজ জাতিতে।

কেউ কেউ মনে করে থাকেন, সংস্কৃতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের সৌন্দর্যপিপাসু মন যেখানে ছন্দ খুঁজে পায়, মানুষ যেখানে মনের খোরাক পায়, ধর্ম সেখানে বাধ সাধবে কেন? এ প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সহজ। হরি কীর্তন যতই ছন্দের আনন্দ থাকুক না কেন, মুসলমান সংগীতামোদী হরি সংকীর্তনের ভঙ্গজন হতে পারে না। কারণ এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও কীর্তন করা ইসলামে অমার্জনীয় পাপ। তেমনি শুকর মাংস যত সুস্বাদুই বলে শোনা যাক না কেন, মুসলমান তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ ধর্মতঃ ওটা নির্বিন্দ। কম্বল থেকে পশম বেছে নিলে যেমন কম্বল আর কম্বল থাকে না, থাকে কতগুলি জঞ্চাল, তেমনি সংস্কৃতি হতে ধর্ম বাদ দিলে সংস্কৃতি

আর সংস্কৃতি থাকে না, থাকে কতগুলি কুসংস্কার।

বাংলা হিন্দুরও ভাষা মুসলমানেরেও ভাষা। যেমন হিন্দু পাঁঠা হিন্দুতেও খায়, মুসলমানেও খায়। কিন্তু যখন হরি নাম নিয়ে বলি দেওয়া হয়, তখন তা মুসলমানের জন্য হারাম হয়ে যায়; অথচ তাই হিন্দুর পরম খাদ্য। আল্লাহু আকবার বলে ঘবাই দিলেই শুধু তা মুসলমানদের খাদ্য হতে পারে। শর্তচন্দ্র যে কথা বলে নিজের অপাগরতার জন্য দুঃখ করেছেন, মুসলমান সাহিত্যিক তো তেমনি কথা দ্বারা নিজের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করতে পারে না, যেখানে এদেশের নবাইজন মুসলমান।

হিন্দুরা যখন বৃত্তিশৈলীর নেক নজরে ছিল মানে ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার হিন্দু সংস্কৃতির প্রাধান্যতার যুগে, অভিজাত্যের জাল বিস্তার করেও মুসলমানদের ধূতি-চাদর পরানো যায়নি, পূজা-পার্বণে ঘোগ দেওয়ানো যায়নি, গোমাংস ভক্ষণ বন্ধ করা যায়নি। কিন্তু আজ এ কথা ভেবে কষ্ট হয় আজ অনেকে বাঙালি সংস্কৃতির নামে ঝটিদের দিনে ধূতি পড়ে, কেউ শ্রদ্ধার নামে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালে, কেউ বিঘের আগে এই সংস্কৃতির নামেই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করে ছেলে-মেয়ে প্রকাশ্যে ঢলাঢলি করে, কেউ কেউ চন্দন ফোঁটা দেয়, কেউ কেউ কেউ শঙ্খ বাজায়, আর কেউ কেউ উলু দেয়, এই সংস্কৃতির নাম করেই অনেক মুসলমান পূজাতে যায় যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, হয়তো এ সংস্কৃতির নাম করেই তথাকথিত সংস্কৃতিপ্রেমী মুসলমানেরা একদিন মৃত্তির পুঁজায় লিপ্ত হতে পারে, আর যত নোংরামীকে এই সংস্কৃতির নামে বৈধতাও দিতেও হয়ত আটকাবেনা।

তবে সবাই যে অঙ্গভাবে এই সংস্কৃতি মেনে নেবে তা মনে করা ভুল। মনে রাখা উচিত যে, মুসলমানি ঐতিহ্যের নামে এ দেশের মানুষ যেমন পার্কিস্টানীদের চাপিয়ে দেয়া উর্দুকে গ্রহণ করেনি, তেমনি বাঙালি ঐতিহ্যের নামে পশ্চিম বংগীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একশ্রেণীর হীনমন্য সংস্কৃতিবিদ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এদেশের মানুষ তাও কোনদিন গ্রহণ করবে না।

বিদ্রঃ এই পোস্ট তাদের জন্য যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করেন

*Kartik Roy = Kartishor Roy*

*kartikroy144@gmail.com*

01755221334

01987379515

## আমাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্ম-চর্চার ধরন

২৭ শে এপ্রিল, ২০০৮ দুপুর ২:১৩

এর আগের একটি পোস্টে সংস্কৃতি নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। এই লেখাটি সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে, অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতির ওপর ধর্মের প্রভাব এবং প্রচলিত ধর্মসমূহের ওপর আমাদের সংস্কৃতির প্রভাব কী রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, বা বাংলাদেশে ধর্মচর্চার ধরনই বা কেমন ইত্যাদি নিয়ে। বিষয়টি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি আমি।

বিনয়কুমার সরকারের যে লেখাটির ('বেঙ্গলি কালচার অ্যাজ এ সিস্টেম অব মিউচুয়াল আকুলটুরেশনস') কথা আগে পোস্টটিতে বলেছি, তিনি এ বিষয়ে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। ১৯৪২ সালে এই লেখাটির বাংলা অনুবাদ করেন ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়। শুধু অনুবাদই নয়, রচনাটির অনুপঙ্খু বিশ্লেষণও হাজির করেন তিনি। এই লেখা ও এর বিশ্লেষণের মূল কথটি হলো সংস্কৃতির বিনিময়। আকুলটুরেশনস কথাটির মানে পারস্পরিক সংস্কৃতি-বিনিময়।

তাঁরা দেখালেন, আদি বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির বিনিময়ের ফলে নতুন সংস্কৃতির ধরন কীভাবে পাল্টে গেলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটার প্রতি তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, সেটি হলো বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের প্রবেশ এবং এর প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতির রূপান্তর, একইভাবে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে বাইরে থেকে আসা ধর্মগুলোর রূপান্তর। তাঁদের মতে- শুধু ইসলামই নয়, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মও বাংলা অঞ্চলের বিদেশী ধর্ম। এইসব ধর্মের আগমনের আগেও এ অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব কোনো ধর্ম ছিলো- তারা এর নাম দিয়েছেন বাঙালি ধর্ম। তাঁরা এ-ও বললেন- ইসলাম আসার আগে এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষ হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিলো- ঐতিহাসিক এই ধারণাটিই ভুল। বরং এক বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠি অ-হিন্দু বা অ-বৌদ্ধ রয়ে গিয়েছিলো, বা কেউ কেউ সেসব ধর্ম গ্রহণ করলেও তা এমনভাবে তাঁদের আদি সংস্কৃতি ছাঁচে ঢেলে পরিবর্তিত করে নিয়েছিলো যে তাদেরকে বড়জোর নিম-হিন্দু বা নিম-বৌদ্ধ বলা যায়। ইসলাম আগমনের ফলে এই অঞ্চলের অ-হিন্দু বা অ-বৌদ্ধ এক বিরাট সংখ্যক লোক, সঙ্গে কিছু হিন্দু এবং কিছু বৌদ্ধও নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়া এ ক্ষেত্রেও ঘটেনি। ফলে প্রত্যেক ধর্মই বাঙালি ধর্মের দাপটে নিজেদের আদি রূপ খুইয়ে নতুন এক রূপ লাভ করে। এ বিষয়ে তাঁদের মত-

বাঙালী হিন্দুরা পরধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত কনভার্ট মাত্র। ইংরেজ খৃষ্টিয়ানরা, মিশরের মুসলমানরা, ইরানের মুসলমানরা যেমন পরধর্মে দীক্ষিত, বাঙালীরাও অবিকল তাই।... হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম সেকালের বাঙালীর 'অনার্ফ' নর-নারীর পক্ষে বিদেশী জিনিস। কিন্তু বাঙালী জাত এই বিদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বশে আনিয়াছিল। তথাকথিত আর্থধর্ম ও সংস্কৃতি অনার্ফ সংস্কৃতির প্রভাবে পড়িয়া অনায়ীকৃত হইয়াছে। ইহাকে বলিব অবাঙালী সংস্কৃতির বাঙালীকরণ। হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম অন্যায়ে বাঙালীদের জয় করিয়া লইতে পারে নাই। বাঙালী ধর্ম-ও তেমনি ইহাকে নাজেহাল করিয়াছে। জয়টা এক তরফা হয় নাই— ধর্মান্তর বা মতান্তর গ্রহণটা হইয়াছে পারস্পরিক। বাঙালাদেশে খুব বেশী লোককে পরধর্ম (হিন্দুত্ব) স্বীকার করানো সম্ভব হয় নাই। অসংখ্য নরনারী অহিন্দু অর্থাৎ বাঙালী বা অনার্ফ রহিয়া গিয়াছিল।... বাঙালীর সৃষ্টিশক্তি ইসলামকেও সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মতো ইসলামকেও বাঙালীদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতিকেও বুঝিয়া রাখিতে হইবে।... বিদেশী সংস্কৃতিগুলোর উপর স্বদেশী সংস্কৃতির প্রভাব গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

[সূত্র : বাঙলায় দেশী-বিদেশী (বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন), বিনয় সরকার, ১৯৪২]

এর ফল কী রকম সুদূর প্রসারী হয়েছিলো তার প্রমাণ হিসেবে বলছেন-

বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের আচার-ব্যবহার ও চালচলনে মিল আছে। কারণ কি? সাধারণের ধারণা-হিন্দুদের কেহ কেহ মুসলমান হইয়া যাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। কথাটার ভিতর কিছু সত্য আছে। কিন্তু আসল কারণ- হিন্দু ধর্মের মতো মুসলমান ধর্মও অন্যার্থ বাঙালী আদিম লোকদের আচার-ব্যবহার আর চালচলন ঢুকিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেই 'বাঙালি'র প্রলেপ পড়িয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর খাঁটি স্বদেশী সংস্কৃতি দিগবিজয় চালাইতেছে। এই কথাটা মনে রাখিলে বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানদের রীতিনীতির ভিতর ঐক্য ও সাদৃশ্যগুলো সহজে বুঝিতে পারিব। দুই সংস্কৃতিই 'বাঙালীকরণের' প্রভাবে অনেকটা একরূপ দেখাইয়া থাকে।

অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের আগমনে আদি বাঙালি সংস্কৃতি তার রূপ পরিবর্তন করেছে বটে, কিন্তু এই সংস্কৃতি এতটাই শক্তিশালী এবং আধিপত্যবিস্তারী ছিলো যে প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দুধর্ম বা ইসলাম ধর্মও তাদের নিজেদের 'আদি' রূপ ধরে রাখতে পারেনি, বরং আদি বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে দুটো বিপরীত মেরুর ধর্ম কখনো কখনো একইরূপ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছে, এখনও হচ্ছে। লেনদেন হয়েছে বটে, তবে বাঙালি সংস্কৃতি পরাজয় স্বীকার করেনি।

এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা আছে আবু জাফর শামসুন্দীনের লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি গ্রন্থভূক্ত বাঙালীর সমন্বিত লোক সংস্কৃতি প্রবন্ধে। তিনি অবশ্য বিনয় সরকারের মতো আর্থপূর্ব বাঙালার ইতিহাস খুঁজে দেখেন নি, চর্যাপদের সময়কাল থেকে (অষ্টম-নবম খ্রিস্টাব্দ) বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাসকে নির্ভর করে বাংলার লোকজীবনে প্রবহমান সংস্কৃতির সমন্বিত রূপটির ধরন-ধারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এখনও বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের গান বাজনা তাল সুর লয় এবং নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র অভিন্ন। নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান এবং মৃতের সৎকার প্রভৃতি ব্যতিরেকে বাকী সকল প্রকার আনন্দোৎসব মেলা প্রভৃতিতে সকলে একত্রিত হয়। লাঠি খেলা, তরবারি ও রামদার খেলা, হাড়ডু ও দাইড়া খেলা প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্রীড়া। বাসগুহের নির্মাণ কৌশল ভিতরের আসবাব, নকশি কাথা, শয়া, তৈজসপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র সবকিছু অভিন্ন। এ মাঠের জমিতে সকলে পাশাপাশি চাষ করে এবং একই ফসল ফলায়। উৎপাদন পদ্ধতিও অভিন্ন। ধর্মীয় বিধানে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ কয়েকটি দ্রব্য ব্যতিরেকে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালীর খাদ্য তালিকা ও পাক প্রণালী অভিন্ন।... সকল বাঙালী পল্লীবাসীর পোশাক পরিচ্ছদ অলংকারপত্র প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি আগেও অভিন্ন ছিল, কিন্তু উন্নতির পর এখনও অভিন্ন আছে।

[সূত্র : লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি আবু জাফর শামসুন্দীন]

আর্যরা এ দেশে আসার আগেই যে এখানকার জনগণের স্বাধীন সাংস্কৃতিক জীবন ছিলো তার অনেক প্রমাণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন- বাংলার গ্রামগুলো ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিভিন্ন পেশার লোকজন এক গ্রামে একসঙ্গে বাস করতো, রাজ-রাজড়াদের উত্থান-পতন তাঁদের এই স্বাধীন জীবনে খুব কমই প্রভাব ফেলতো। কিন্তু

আর্যদের আগমন, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ-হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের আগমন তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব ফেলে। তবে এই প্রভাব যতো না রাজনৈতিক কারণে তারচেয়ে বেশি দার্শনিক কারণে পড়েছে। যখনই যে ধর্ম এখানে এসেছে, তখনই এখানকার জনগণ তাদের নিজেদের সুবিধামতো একে 'সংশোধন' করে গ্রহণ করেছে। তিনি মনে করেন 'ফান্ডামেন্টাল' বলে জগতে কোনো জিনিসই নেই, এমনকি ইসলাম নিজেও তার জন্ম থেকেই যে 'ফান্ডামেন্টাল' নয়, বরং এতে তার পূর্ববর্তীকালের অনেক ধর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিনি অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে সেটি প্রমাণণ করেছেন। আর ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন সম্বন্ধে তাঁর মত-

ভারতে যে ইসলাম রাজকীয় ধর্মরূপে পাকাপাকিভাবে প্রবেশ করে সেটা হয়রত মোহাম্মদ (দঃ) প্রবর্তিত আরবমরণের 'নির্ভেজাল' ইসলাম ছিল না। এ ইসলাম ইরান, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ পার হওয়ার কালে সে সব দেশের বহু লোকাচার সহ প্রবর্তিত হওয়ার ৬০০ বছর পর, তুর্ক আফগান বিজয়ীদের সঙ্গে আসে।

বাংলাদেশে মুসলমান জনগোষ্ঠীই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু যে ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান তারা মেনে চলেন, তার স্বরূপটি বুঝে নিতে হলে আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কথা বলার। আমি যে ইতিহাসের কথা বলছি সেটা রাজা বাদশাহদের ইতিহাস নয়- জনগণের ইতিহাস। মুশকিল হলো জনগণের ইতিহাস সবসময় অলিখিতই থেকে যায়- লিখিত ইতিহাসে জনগণ থাকে বরাবরই উপেক্ষিত, ইতিহাস মানেই যেন রাজ-রাজড়াদের ব্যাপার, জনগণের যেন কোনো ভূমিকাই ছিলো না ইতিহাসের কোনো পর্বে, কোনো ঘটনায়। ফলে এই ইতিহাস থেকে জনগণের মন বুঝতে হলে আমাদেরকে অকেখানিই কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। বিষয়টি অল্প কথায় সারা অসন্তুষ্ট, এর জন্য ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই বলে খুবই সংক্ষেপে দু-একটি তথ্য উল্লেখ করবো। প্রথমেই যা বলা দরকার তা হলো- বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে মূলত সুফি-সাধক ধর্মপ্রচারকদের কারণে, শাসক শ্রেণীর জন্য নয়। শাসকদের ধর্ম দেখে যারা ধর্ম পরিবর্তন করে তারা আর যাই হোক সাধারণ জনগণ নয়, উচ্চশ্রেণীর সুবিধাবাদী লোকজন। শাসকদের কাছ থেকে সুদৃষ্টি পাওয়ার আশায় কেউ কেউ ধর্ম পরিবর্তন করলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এতে কিছুই যায় আসে না। শাসকদের ধর্ম কি, তা নিয়ে জনগণের কোনো কৌতুহল থাকার কথা নয়। এ অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক মানুষ যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্তত তিনটি কারণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় : ১. ব্রাহ্মণবাদীদের বর্ণভিত্তিক বিভেদনীতি, অত্যাচার-নিপীড়ন, চাপে ও তাপে সাধারণ জনগণ অতিষ্ঠ ছিলো, ২. ঠিক সেই রকম একটি ক্রান্তিকালে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ও শান্তির বাণী নিয়ে ইসলাম ধর্ম এদেশে প্রবেশ করেছিলো, এবং ৩. এ বাণী যারা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন সুফি সাধক- অনাদুষ্বর জীবনযাপন, মানুষের মন বুঝে কাজ করা ও কথা বলার ক্ষমতা, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও নিরহংকারী সন্তোর মতো সাধারণ মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা-সংকট-সমস্যার সঙ্গী হতে পারার সহজাত প্রবণতা যাঁদেরকে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলো। এ অঞ্চলের মানুষ যে ইসলাম আগমনেরও বহু আগে থেকেই শান্তিপ্রিয় ছিলো সেটা বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা দেখেও বোঝা যায়- ইসলামের আগে বৌদ্ধধর্মেও শান্তি ও সমপ্রীতির কথা বলা হয়েছিলো। বৌদ্ধদেরকে হটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণবাদীদের পুনরুত্থান এবং তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য এ অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষ মন থেকে মেনে নিয়েছিলো এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েছিলো- এমনটি মনে করার কোনো কারণই নেই। কিন্তু রাজশক্তি-সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে তাদের কিছু করারও ছিলো না। শান্তির বাণী নিয়ে আগত ইসলামকে তারা দেখেছিলো নতুন আশ্রয় হিসেবে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- সুফিরা যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন তা আরবে উদ্ভাবিত মূল ইসলাম নয়, বরং দার্শনিকভাবে অনেকখানি পরিবর্তিত ও আচারসর্বস্বতা-বর্জিত ইসলাম। সুফিবাদের জন্ম মূলত পারস্যে, মূল ইসলাম ওখানে গিয়ে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যায়; আবার এই সুফিরা যখন ভারতবর্ষে এলেন সেই সুফিবাদেরও খানিকটা পরিবর্তন সাধন করতে হলো। কোনো দর্শনই যে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে তার অবিকৃত রূপ ধরে রাখতে পারে না- এই প্রগতিশীল ধারণাটি সুফিদের মধ্যে ছিলো; তাই তাঁরা ভারতবর্ষে এসে এই জনগোষ্ঠীর মন বুঝতে চেষ্টা করলেন। এবং আবিষ্কার করলেন- এই জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে প্রেমের কথা বলতে হবে, ভক্তির কথা বলতে হবে- কারণ এ অঞ্চলে দুটোরই জয়জয়কার। অতএব সুফিবাদ নিজেকে খানিকটা

বদলে নিলো- মানুষের কাছে তারা বলতে লাগলেন প্রেমের কথা, বোঝাতে লাগলেন স্বষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক দ্বন্দ্বের নয়, প্রেমের। একমাত্র প্রেমের মাধ্যমেই পাওয়া যাবে স্বষ্টাকে- অন্য কোনোভাবে নয়। প্রেম ও ভক্তির এই কথাগুলো এ অঞ্চলের মানুষের কাছে আগে থেকেই পরিচিত ছিলো- তার সঙ্গে যুক্ত হলো মানুষ-মানুষে সমতার কথা, প্রাতৃত্বের কথা, সমান অধিকারের কথা, শান্তি ও সম্প্রীতির কথা। তরবারী দিয়ে নয়, কঠোর ধর্মীয় আচারসর্বস্বতা দিয়ে নয়, ভয়-ভীতি-হংকার দিয়েও নয়- স্বেফ শান্তি-সম্প্রীতি-মানবতা-সাম্য-প্রেম-ভক্তি-প্রাতৃত্ব ইত্যাদির কথা বলে সুফিরা জয় করে ফেললেন একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে। এমনকি রাজশক্তি-সামাজিক শক্তি বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কোনোরকম দ্বন্দ্ব লিপ্ত না হয়েই তাঁরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের দার্শনিক প্রজ্ঞার কারণে। এ অঞ্চলে ইসলামের জয়ের ইতিহাস বলতে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বোঝায় না, বোঝায় এই দার্শনিক বিজয়ের ইতিহাস। আর এই ইতিহাস না জানলে বাঙালি মুসলমানের মনোজগৎ বোঝা সম্ভব নয়। এই রচনায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই, মোদ্দা কথা হলো- এ দেশের মানুষের মনোজগতে আছে শান্তি-সম্প্রীতি-প্রাতৃত্ব-মানবতা ও সাম্যের প্রতি প্রেম। কোনো মৌলবাদী কঠোর কঠিন তত্ত্ব দিয়ে তাদেরকে জয় করা যায় নি- ভবিষ্যতেও যাবে না।

আবু জাফর শামসুন্দীনের ভাষায়-

ফান্ডামেন্টাল বলে কোনো বস্তু মানবজাতির সামাজিক জীবনে কোন কালে ছিল না, সুতরাং তার পুনঃপ্রবর্তন প্রচেষ্টাও সাফল্যমান্তি হওয়ার নয়।

কিন্তু চেষ্টাটি বহুকাল থেকেই চলছে, পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত একদল ধর্মান্ধি লোক ও কয়েকটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল এ দেশকে একটি ধর্ম-রাষ্ট্রে পরিণত করার দিবাদ্বন্দ্বে বিভোর হয়ে আছে। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোও তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয়-সমর্থন দিয়ে চলেছে। এমনকি প্রগতিশীলতার মুখোশ পড়ে কিছু ছদ্মবেশী বুদ্ধিজীবীও তাদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সামিল হয়েছেন। তাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেই ধরে নেয়া যায়। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির যে হাজার বছরের ইতিহাস তাতে নিশ্চিত করেই বলা যায়, একে পরাজিত করা যাবে না। বাঙালি তাদের সংস্কৃতিকে চিরকাল অপরাজেয় রূপে দেখতে চেয়েছে, আর চেয়েছে বলেই পরাজিত হতে দেয় নি। এই এতকাল পর এসে তাদেরকে পরাজিত করা যাবে, এটা কোনো মূর্খ ছাড়া আর কে-ই বা ভাববে!

17 টি +8/-0

## মন্তব্য (১৭) মন্তব্য লিখুন

১ | ২৭ শে এপ্রিল, ২০০৮ বিকাল ৩:০২

রিয়াজ শাহেদ বলেছেন: শেষ কথাগুলো ভাবাচ্ছে।

ঠিক আছে, বাঙালি কখনো তার সংস্কৃতিকে হারতে দেবেনা, ধরে নিচ্ছি। মূর্খ ছাড়া এটা কেউ চিন্তাও করবেনা, তাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু স্যার, খেয়াল তো অবশ্যই করেছেন- মূর্খদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। মূর্খদের এই সংখ্যাবৃদ্ধি কি বাঙালি জীবনে কোনো আশংকাজনক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে বলে আপনার মনে হয়?



**স্বাক্ষর শতাব্দি** বলেছেন: আপনি তো এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষের লোক বলে মনে হচ্ছে, আপনার মধ্যবিত্ত নিয়ে  
একটা লেখা এবং আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমাকে একজন দিয়েছিলো। এখন  
মনে পড়ল আপনার রাজনৈতিক দর্শন পড়তে গিয়ে।

কিছু মনে করবেন না, আপনি আহমেদ ছফা দ্বারা প্রভাবিত মনে হচ্ছে।

মধ্যবিত্ত নিয়ে আপনার লেখায় আধিবিদ্যক ঘোঁক আছে, এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?

৭| ২৮ শে এপ্রিল, ২০০৮ রাত ৩:৩৯

**স্বাক্ষর শতাব্দি** বলেছেন: দুঃখিত এভাবে আপনাকে অপ্রস্তুত করার জন্য।

আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ভালো হয়, আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোট, আমার আগের প্রজন্মের কাছে  
আমার অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছে করে, মধ্যবিত্ত প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দিন অন্তত।  
ধন্যবাদ।

২৮ শে এপ্রিল, ২০০৮ রাত ৩:৫৬

**আহমাদ মোস্তফা কামাল** বলেছেন: মধ্যবিত্তের পরিচয়চিহ্ন লেখাটির কথা বলছেন? যদি ওটাই হয়ে থাকে  
তাহলে ওখানে আধিবিদ্যিক ঘোঁকটা কোথায় বুঝতে পারলাম না। ধরিয়ে দিলে ভালো হয়। ওই লেখায় আমি  
মধ্যবিত্তকে চেনার চেষ্টা করেছিলাম। সমালোচনা ও সহানুভূতি দুটোই ছিলো ওই লেখায়। আমাদের এখানে  
কথায় কথায় মধ্যবিত্তদের গালাগালি করা হয়, যেন মধ্যবিত্তরা কোনো মানুষই নয়। কেন? আবার এই গালাগালি  
মধ্যবিত্তরা গায়েই মাখে না। কেন? মধ্যবিত্ত কারা? কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে একজন মানুষকে বা একটি শ্রেণীকে  
মধ্যবিত্ত বলা যাবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ওই লেখা।... কারো প্রভাব আমার ওপর পড়েনি। আমি  
যে দৃষ্টিকোণ থেকে ওই লেখাটি লিখেছি, আর কেউ-ই সেটি লেখেননি। আমি শতভাগ নিশ্চিত।...  
আমাকে এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষের লোক বলে মনে হওয়ার কারণ কি? একটু পরিষ্কার করে বললে ভালো হয়।  
নইলে বুঝবো কিভাবে?...  
আমি মোটেও অপ্রস্তুত হইনি। আপনার যখন যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করবেন, আমি খোলামনে উত্তর দেব।

৮| ২৮ শে এপ্রিল, ২০০৮ ভোর ৪:১৩

**স্বাক্ষর শতাব্দি** বলেছেন: ধন্যবাদ।

আপনি তাহলে নিজেকে এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষের লোক নন বলে দাবি করছেন?

যে কারণে আধিবিদ্যক মনে হয়েছে: "মধ্যবিত্তরা অমর ও অক্ষয়"

আমার মনে হয়েছে আপনি পুরো লেখাটিতে যে চেষ্টাটি করেছেন তা হলো মধ্যবিত্ত সম্পর্কে মার্ক্সবাদী  
বুদ্ধিজীবিদের বিশ্লেষণকে ভুল প্রমাণ করতে। আর প্রভাবের ব্যাপারটা বলেছি ২ টা মিল পেয়ে, ১) বাঙালি  
মুসলমান তত্ত্ব ২) রাজনৈতিক দর্শনের লেখাটা পড়ে[দুঃখিত, এটা আমার ভুল হতে পারে, আমি খুব সহজেই  
উত্তেজিত হয়ে যাই]

"মধ্যবিত্তের পরিচয়চিহ্ন" লেখাটিতে আপনি যে নীতিবোধের প্রসঙ্গ এনেছেন, সেটিও কি নৈতিকতা ব্যাপারটিকে  
বিমৃত করার চেষ্টা নয়?

ভালো থাকবেন।

২৯ শে এপ্রিল, ২০০৮ দুপুর ১:৪৯

**আহমদ মোস্তফা কামাল বলেছেন:** এ দুদিন লগইন করা হয়নি বলে আপনার মন্তব্য দেখতে পারিনি, উত্তরও দিতে পারিনি। দুঃখিত।

আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি।

"আপনি তাহলে নিজেকে এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষের লোক নন বলে দাবি করছেন?"

এস্টাবলিশমেন্ট-এর কথাটা আপনি তুলেছিলেন এবং আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন আপনার এ কথা মনে হলো? আপনি উত্তর না দিয়ে উল্টো জিজ্ঞেস করছেন! আমি নিজের সম্বন্ধে কিছুই দাবি করছি না। যারা নিজেদেরকে এ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট-এর লোক বলে দাবি করে, তারা আবার এস্টাবলিশমেন্ট-এর করুণা পেলে খুশি হয়। এদের কারণে এরকম দাবি করাটাও এখন হাস্যকর বলে মনে হয়। তবে শুধু এটুকু বলতে পারি, আমি আমার লেখায় এবং জীবনঘাপনের প্রতিটি পর্যায়ে এস্টাবলিশমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করেছি। এ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট একটা সামগ্রিক ব্যাপার। আপনি ওই শব্দ দিয়ে কী বোঝাতে চান জানি না, তবে আমি যেটুকু বুঝি তা হলো আমরা এস্টাবলিশমেন্ট-এর বাইরে থেকে জীবন কাটাতে পারি না। (যেমন পরিবার, সমাজকাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিভিন্ন বিষয়ে সমাজে প্রচলিত এবং গৃহীত ধারণা সবই আসলে এস্টাবলিশমেন্ট, আপনি-আমি এর বাইরে যেতে পারি?), কিন্তু এর মধ্যে থেকেই এর বিরোধিতা করা, এর সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাটাই তো এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ।

"আমার মনে হয়েছে আপনি পুরো লেখাটিতে যে চেষ্টাটি করেছেন তা হলো মধ্যবিত্ত সম্পর্কে মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবিদের বিশ্লেষণকে ভুল প্রমাণ করতে।"

কাউকে ভুল প্রমাণ করার জন্য আমি লিখতে বসি না। আমি লিখি নিজের তাগিদে। যদি আমার লেখা কাউকে ভুল প্রমাণ করে সেটি তাদের সমস্যা, আমার নয়। ... ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্ক্সবাদের সঙ্গে নৈকট্য বোধ করি। কিন্তু বাংলাদেশে যারা মার্ক্সবাদী রাজনীতি করেন বা মার্ক্সবাদের চর্চা করেন তাদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। মার্ক্সবাদ আর বাংলাদেশের মার্ক্সবাদী এক জিনিস নয়, আশা করি এই সত্যটুকু স্বীকার করার মতো গুরুত্ব আপনার আছে। মার্ক্সবাদীদের কাছে আমার প্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি, তাদের নিয়ে তাই কথাও বলি বেশি। কিন্তু তারা এমন একটি ফ্রেম তৈরি করেছেন এবং সবকিছুকে সেই ফ্রেমে বন্দি করে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে চান যে, এর বাইরের যে-কোনোকিছু তাদের কাছে কটুকথা শুনবেই। একজন লেখক হিসেবে আমি তো এমন কোনো ফ্রেমে নিজেকে বন্দি করে ফেলতে পারি না! মার্ক্সবাদীদের ব্যাখ্যার বাইরেও জীবন আছে, এ কথা তাদের কে বোঝাবে? একজন লেখকের দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত তত্ত্বের উর্ধ্বে থেকে জীবনকে খুঁজে দেখা।

"প্রভাবের ব্যাপারটা বলেছি ২ টা মিল পেয়ে, ১) বাঙালি মুসলমান তত্ত্ব ২) রাজনৈতিক দর্শনের লেখাটা পড়ে"

বাঙালি মুসলমান শব্দটি আহমদ ছফা খুব বেশি ব্যবহার করতেন। তাই বলে কি অন্য কেউ এটি ব্যবহার করতে পারবেন না? বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত নিয়ে কথা বলতে হলে এই টার্মটি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় কি? বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং মুসলমান মধ্যবিত্তের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস তো এক নয়। এদের জন্মের মধ্যে সময়ের পার্থক্য প্রায় একশ বছর। আপনি কি এই বিষয়টিকে বিবেচনা করবেন না? ব্যাপারটা কিন্তু ওই প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবেই বলা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আহমদ ছফার বিশ্লেষণ আর আমার বিশ্লেষণ কি এক? কোথাও কি মিল খুঁজে পেয়েছেন?

"মধ্যবিত্তের পরিচয়চিহ্ন" লেখাটিতে আপনি যে নীতিবোধের প্রসঙ্গ এনেছেন, সেটিও কি নৈতিকতা ব্যাপারটিকে বিমূর্ত করার চেষ্টা নয়?

আমার তো মনে হয়, আগে বিমৃত্ত ছিলো, আমি বরং অধিকতর মৃত্ত করে তুলেছি।

আপনাকে ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা রইলো আপনার জন্যও।

৯| ২৮ শে এপ্রিল, ২০০৮ সকাল ১১:৫১

**রিয়াজ শাহেদ** বলেছেন: অফটপিক, কমেন্টটা পড়ার পর মুছে দিতে পারেনঃ স্যার কাল রাতে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন নতুন লেখা দিচ্ছি না কেনো; "ভালোবাসার প্রাণরসায়ন" নামের লেখাটা হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকবে; বছরখানেক আগে সামান্য খেটেখুটে এই "গবেষণামূলক" প্রবন্ধটা ( ) লিখেছিলাম, সম্প্রতি সেটা ব্লগে ছেড়েছি ৩টি খন্ডে। পড়ার অনুরোধ রইলো। [Click This Link](#)

১০| ৩০ শে এপ্রিল, ২০০৮ রাত ১২:৩২

**স্বাক্ষর শতাব্দি** বলেছেন: "মার্কিসবাদ আর বাংলাদেশের মার্কিসবাদী এক জিনিস নয়, আশা করি এই সত্যটুকু স্বীকার করার মতো ঔদ্যোগ্য আপনার আছে। মার্কিসবাদীদের কাছে আমার প্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি, তাদের নিয়ে তাই কথাও বলি বেশি। কিন্তু তারা এমন একটি ফ্রেম তৈরি করেছেন এবং সবকিছুকে সেই ফ্রেমে বন্দি করে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে চান যে, এর বাইরের যে-কোনোকিছু তাদের কাছে কাটুকথা শুনবেই। একজন লেখক হিসেবে আমি তো এমন কোনো ফ্রেমে নিজেকে বন্দি করে ফেলতে পারি না! মার্কিসবাদীদের ব্যাখ্যার বাইরেও জীবন আছে, এ কথা তাদের কে বোঝাবে? একজন লেখকের দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত তত্ত্বের উর্ধ্বে থেকে জীবনকে খুঁজে দেখা।"

সহমত

অশেষ ধন্যবাদ

৩০ শে এপ্রিল, ২০০৮ দুপুর ১২:৩০

**আহমাদ মোস্তফা কামাল** বলেছেন: ধন্যবাদ।

## আপনার মন্তব্য লিখুনঃ

**মন্তব্য করতে লগ ইন করুন**

## আলোচিত ব্লগ

- সালমান রশদির ওপর আক্রমণ এবং এই আক্রমণ নামক কোপাকুপি নিয়ে কিছু কথা!
- রম্য: ঘদি কিছু মনে না করেন
- হাওড়া ব্রিজ দর্শন এবং .....
- স্বর্গ থেকে বলছি...
- মন্তব্য কখনো গন্তব্য ঠেকাতে পারে না-কিন্তু মৃত্যু ঠেকিয়ে দিল সব

- অনলাইনে আছেন: ২৯ জন ব্লগার ও ৮৩০ জন ভিজিটর (৭৮৭ জন মোবাইল থেকে)
- সাম্প্রতিক মন্তব্য
- গোটিশবোর্ড ব্লগ

[full version](#)

## বাংলাদেশে হিন্দু সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে ভারতীয় ধারাবাহিকের ভূমিকা কী?

সমস্ত সম্পর্কিত (30টি) ▾

সাজান প্রস্তাবিত



মুক্তচিন্তা

আকাশ নীল ○ উত্তর দিয়েছেন। লেখকের 233টি উত্তর রয়েছে ও 1.6 লা বার সেগুলি দেখা হয়েছে।

19 জুন, 2021

বাঙালি সংস্কৃতির সাথে হিন্দু সংস্কৃতির অনেক আগে থেকেই একটা বড় ধরনের মিল আছে। ভারতীয় সিরিয়াল গুলো এগুলো মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশ বর্তমানে কিছুটা সরে এসেছে হিন্দু সংস্কৃতি থেকে। তবে সম্পূর্ণ সেরে আসতে অনেক দেরি তবে বাঙালি সংস্কৃতি মানে হিন্দু সংস্কৃতি বলা ঠিক হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সংস্কৃতি এর সাথে অন্যান রাজ্যের হিন্দু সংস্কৃতির কিছু অলিঙ্গ আছে। আমরা মূলত বাঙালি সংস্কৃতি অনুসর করি এটাকে হিন্দু সংস্কৃতি ট্যাগ লাগান ঠিক হবে না। উদাহরণ হিসাবে এখন জামায় ষষ্ঠী চলছে। এটা জৈষ্ঠ্যমাসের প্রথম দিন পালিত হয়। জৈষ্ঠ্যমাস কিন্তু বাংলা মাস। অন্যান রাজ্যে এটা তেমন দেখা যায়না। আসাম ত্রিপুরাতে দেখা যায় কিছুটা। এটাকে বাঙালি সংস্কৃতি বলা উচিত। এখান থেকে বর্তমানে বালনাদেশের একটা অংশ সরে গিয়েছে। সরা যাওয়া কে আমি খারাপ বলছি না। কারণ ইংরেজদের আসার পর বাঙালি সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন এসেছে। ভবিষ্যতে আরো পরিবর্তন হবে।

দুই কথায় প্রশ্নের উত্তরঃ বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি নয় বরং বাঙালি সংস্কৃতিই আমাদের নিজের পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি এবং তারা এটাই পালন করে এসেছে। তাই ভারতীয় সিরিয়াল আর যাই করুক হিন্দু সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছে না তবে বাঙালি সংস্কৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে।

আপডেটঃ বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে আপনি কি অন্য কোন বিদেশি সংস্কৃতি মনে করেন!?

426 বার দেখা হয়েছে · আপডেটগুলি দেখুন

▲ 6 | ▾ 0 | ⌂ 0 | ⌂ 0 | ⌂ 0



Chandan Das

জুম কালার ফটো ল্যাব এ কলকাতা, (১৯৮৮-বর্তমান) · লেখকের 354টি উত্তর রয়েছে ও 2.3 লা বার সেগুলি দেখা হয়েছে · 2 বছর

### সম্পর্কিত হিন্দু বাঙালিরা নিজের ধর্মকে এত হেঁট করে দেখে কেন?

শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিরা অনেক উদার চিন্তক। আমাদের সৌভাগ্য বাংলা নবজাগরণ এই বঙ্গে হয়েছিল এবং আমরা সেই নবজাগরণের আশীর্বাদ পূর্ণ। আমার মতে মানুষের জীবনে ধর্মের ভূমিকা কম। আগে মানুষ এসেছে। তার অনেক পরে ধর্ম এসেছে। ধর্ম মানুষের সৃষ্টি। মানুষকে ধর্ম সৃষ্টি করেনি। আর শিক্ষা, জ্ঞান মানুষকে উদার ও স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী করে তোলে। তাই আজকাল উন্নত দেশ সমূহে রাবিবার প্রার্থনার সময় লোক হয়না। চার্চে তা ছাড়া হিন্দু ধর্মে ধর্মীয় আচার মানলেও হিন্দু না মানলেও হিন্দু। কোন বাধ্যতা নেই। তাই হিন্দু বাঙালি হিন্দু ধর্ম নিয়ে মোটেই অন্য ধর্ম ধারীদের মত গোঁড়া নয়।

▲ 61 | ▾ 0 | ⌂ 0 | ⌂ 0 | ⌂ 0



সুলতান মোহাম্মদ

সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এ/তে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। লাবীদ বিন বাশার, বাংলাদেশ এ থেকেছেন (1996-2022) আপডেট করেছেন · 1 বছর

### সম্পর্কিত বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যা কমছে কেন?

ফেসবুক-ইউটিউব সহ প্রায় সকল সোশালমিডিয়া সাইটেই কিছু উচ্চ শিক্ষিতদের এমন দাবী করতে দেখা যায় যে — “বাংলাদেশে মুসলিমদের অত্যাচারে হিন্দুদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। গত ৫০ বছরে হিন্দুদের সংখ্যা ২২% থেকে কমে ৮% নেমে গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি”

তাদের এই দাবীটা প্রমাণ করে যে তারা অংক ও জানে না। সারাদিন প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে গেলেই হবে, অংক দিয়ে কি করবে তারা, তাই না?

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫১ সালে মোট জনসংখ্যার ২২% হিন্দু এবং ২০১১ সালে ৮% হিন্দু। অর্থাৎ হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার হিসেবে কমছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মোট জনসংখ্যার কি হচ্ছে?

যাখন ২২% হিন্দু ছিলো, তখন মোট জনসংখ্যার হিসেবে কমাটির আশেপাশে। কিন্তু এখন ৮% হিন্দু

▲ 128 | ▾ 0 | ⌂ 2 | ⌂ 0 | ⌂ 0



↑ আপনার উত্তর ব্যক্তিগত রয়েছে

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

একেবারেই না

অবশ্যই হ্যাঁ

## সম্পর্কিত বাংলাদেশে শতকরা ৯১ ভাগ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু সংস্কৃত কেন বহুল প্রচলিত?

সংস্কৃত হলো মানুষের জীবনযাপন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ভাষা পদ্ধতি, যোগাযোগ এবং আচরণ-আচরণ, এ সবগুলোর সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলা হয়। যদিও সংস্কৃতি একটি জাটিন ধারণা, তবে এটি সচেতনভাবে এবং অবচেতনভাবে উভয়ভাবেই আমাদের জীবনের প্রতিটি দিককেই প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন মূল্যবোধ ভাষা এবং আচরণ সবগুলোই এই অঞ্চলের মানুষের সাথে মিলে। এইখানে বাঙালিরা হাজার বছর ধরে বসবাস করছে। আর পূর্ব বাংলা বাংলাদেশ আমরা সবাই ভারতীয় সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ যা শুধুমাত্র ধর্মের বিচারে পৃথক করা সম্ভব নয়।

▲ 16 ▼ ⟳ ⟲



### দোলনচাঁপা

পরিচিত ধর্মমতগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা - ৭ আগস্ট

সম্পর্কিত কিছু কিছু হিন্দুকে (বাংলাদেশি বা ভারতীয়) বলতে শুনেছি যে বাংলাদেশে যেসব ওয়াজ মাহফিল হয় তাতে নাকি হিন্দু ধর্মের অপমান করা হয়। তো এই কথাটার সত্যতা কতটুকু? এর কোনো উদাহরণ দেখাতে পারবেন কি?

জী, আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি এই কথার সত্যতা ১০০%।

ওয়াজ মাহফিলের সাধারণত একটা ফরম্যাট হয়ঃ

১. **আদি পর্বঃ** মাহফিল শুরু হয় ইসলামী কিছু প্রবচন দিয়ে
২. **ক্রমন পর্বঃ** তার পরে শুরু হয় সারা বিশ্বে নিরীহ মুসলমানরা কিভাবে প্রতিদিন নির্ধারিত হচ্ছে (উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে থাকে ১) ফিলিস্তিন ২) কাশ্মীর ৩) আমেরিকা কিভাবে মুসলমানদের ধ্বংস করছে ৪) কেন জানিনা উইয়ুব-চীন নিয়ে খুব বেশী কথা শুনি নাই
৩. **উত্তেজনা পর্বঃ** ১) ফিলিস্তিন ২) কাশ্মীর ৩) আমেরিকা যেহেতু উদাহরণে আসে, তাই এইবার মাহফিলে স্বত্বাবতই আসে ইহুদী-নাসারা-কাফের-ভারত (হিন্দু গালি গালজের মাধ্যমে তোহিদ জনতাদের উত্তেজিত করা। পড়া চালিয়ে যান সব চেয়ে বেশী সামঞ্জস্য হিন্দুদে

▲ 61 ▼ ⟳ ⟲ 16



### সতেজ রহমান

জানতে আগ্রহী· নাদিম, বাংলাদেশ এ/তে থাকেন (2003-বর্তমান) আপডোট করেছেন লেখকের 168টি উত্তর রয়েছে ও 2.3 লা বার সেগুলি দেখা হয়েছে · 16 এপ্রিল

সম্পর্কিত বাংলাদেশে হিন্দু বিরোধী মনোভাব কেন বেড়ে চলছে?

বাংলাদেশে হিন্দু বিরোধী মনোভাব বাড়েনি। বেড়েছে ভারত বিরোধী মনোভাব। তাই যে সকল হিন্দু চরমভাবে ভারত সাপোর্ট করে তাদের প্রতি একটা বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে এই মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে বর্তমানে পাবলিক প্লেসে কেউ খাওয়ার সময় সম্ভাবনা আছে, সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক। তাই দুয়েকজন হিন্দুস্তানি সাপোর্টার থাকলেও তাদের জনসম্মুখে খুব একটা সরব হতে দেখা যায় না।

একসময় আমি নিজেই ভারতের সাপোর্ট পড়া চালিয়ে যান বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময় একসাথে বাংলাদেশ-ভারতের প্রতিকাণ্ড বানিয়েছি। আমরা দুই দলের মধ্যে কোনো প্রতিপক্ষ নেই।

▲ 240 ▼ ⟳ ⟲ 4 109



### রহমানীপ তৃষ্ণ

সফটওয়্যার প্রোগ্রামার · 2 বছর

সম্পর্কিত কোনো বাংলাদেশি মুসলমান যদি কোনো বাংলাদেশি বা ভারতীয় হিন্দুকে মালাউন, মুশরিক বা কাফের ইত্যাদি বলে, তখন হিন্দু ব্যক্তিটির এর জবাবে কী বলা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

এক বাক্যে উত্তর দিতে চাইলে বলবো সোজা কেটে পড়ুন। কোনো কথাই বলার প্রয়োজন নেই কারণ যে এই ধরণের কিছু আপনাকে বলেছে তাকে কোনোভাবেই কোনো কিছু বোঝানো সম্ভব হবে না, কেবল আপনার মেজাজ আরো বেশি খারাপ হবে।

তবে ব্যাপারটা কিছুটা স্পর্শকাতর বিধায় একটু গভীরভাবে চিন্তা করি সেই রাগ আর খুব একটা থাকে না। আর সেটাই আমি আপনাকে বলতে চাই।

দেখন যে ব্যাক্তি আপনাকে উদ্দেশ্য করে আবেদন করে আবেদন করেছে তাকে কখনোই বাংলাদেশি কি



অজ্ঞাতনামা  
2 বছর

সম্পর্কিত একজন মুসলিম হিসেবে হিন্দুর কোন আচরণে এবং হিন্দু হিসেবে মুসলিমের কোন আচরণে করুনা হয়?

কেজি ক্লাস- ওর পাশে বসবো না. ও হিন্দু.

ক্লাস ফোর- তুই ও তোর পরিবার দোজখ এর আগুন এ পুড়ে মরবি. (এখানে আসলে একটা এক্সপ্লানেশন আছে. আরবির শিক্ষক আগের রাতে কাফির নিয়ে আলোচনা করেছিলেন.)

ক্লাস ফাইভ - আজ মা তোর জন্য আলাদা করে সবজি নড়ুলেস বানিয়েছে, চল একসাথে খাই.

দুই চামচ খাবার পর মাংস এর টুকরা বের হলো...সেই সাথে আশেপাশের সবার অট্টহাসি. ও গুরু খাইসে .....হাহাহা.....

ক্লাস টেন - স্কুল এর শেষ ফিল্ড ট্রিপ. বান্ধবী এক মাস আগে থেকে প্ল্যান করছে সবাই বাড়ি থেকে কিছু কিছু আনবে. একসাথে খাবো...তুই চিন্তা  পড়া চালিয়ে যান  মানি আনবো. পিকনিক এর সময় বাঞ্ছা আমার হাতে আসলো. আমি মধ্যে দেবার চিন্তা আসে আর আজ্ঞাসা করলাম টি

▲ 230 | ▾ 0 | ⏴ 5 | ⏵ 0 | ০ 80



Soumalya Som Seal

ভারতবর্ষ এ/তে থাকেন (1993-বর্তমান) . লেখকের 286টি উন্নত রয়েছে ও 5.3 লা বার সেগুলি দেখা হয়েছে .  
11 মাস

সম্পর্কিত যেখানে সমস্ত মুসলিম, অধিকাংশ শিখ, বৌদ্ধ, জৈন নিজের ধর্ম নিয়ে এত গর্বিত সেখানে কিছু হিন্দু প্রধানত কিছু বাঙালি হিন্দু নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে অপ্রচার এবং মুসলিম ধর্মের গুণগান করে বেড়ান কেন?

হিন্দু মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, কৃষ্ণান, টাও, কনফুসিয়াস, আফ্রিকার আদিবাসী ধর্ম, যা ইচ্ছে আপনি পালন করতে পারেন। কিন্তু "ধর্ম নিয়ে গর্বিত" মানে কি? আপনি কি "আমার দুটো চোখ আছে" বা "আমার দুটো পা আছে" বলে গর্বিত বোধ করেন? নাকি "আমি জল পান করি" বা "খাদ্য খাই" বলে গর্বিত হন?

আপনি কোথায় কখন জন্মেছেন তার উপর আপনার ধর্ম নির্ভর করছে। যদি বিটেনে জন্মান, কৃষ্ণান হবার সুযোগ সব থেকে বেশি। পাকিস্তান হলে মুসলিম, ভারতীয় হলে হিন্দু মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন অনেক কিছুই হতে পারেন। আবার জাপান  মর অনুসারী হয়ে জন্মতেন। আপনি নিজে কি সব ধর্ম পাদে তার তুলনায় বিটেনের ধর্ম পাদে তার তুলনায় ধর্ম ঠিক করেছ

▲ 29 | ▾ 0 | ⏴ 2 | ⏵ 0 | ০ 2



Manab Mitra

22 জুলাই

সম্পর্কিত বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনে সবাই চুপ কেন?

লাখ টাকার প্রশ্ন 'বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনে সবাই চুপ কেন' !!

বাংলাদেশের মুসলমানরা চুপ কেননা তারা ভাবে এটা তাদের অধিকার।

বাংলাদেশের হিন্দুরা চুপ কেননা তারা শক্তিহীন।

ভারতের হিন্দুরা চুপ কেননা বাংলাদেশের হিন্দুদের বিষয়ে তারা নিষ্পত্তি।

▲ 66 | ▾ 0 | ⏴ 16 | ⏵ 0 | ০ 16



আনিসুর রশিদ দিপু

পটোরহেড - Nafisa Quaim, ঢাকা, বাংলাদেশ এ/তে থাকেন (2005-বর্তমান) এবং ওয়াসিমা ওবায়েদ সুহা,  
ঢাকা, বাংলাদেশ এ/তে থাকেন (2007-বর্তমান) আপেভোট করেছেন লেখকের 200টি উন্নত রয়েছে ও 8.2 লা  
বার সেগুলি দেখা হয়েছে . 1 বছর আপডেট হয়েছে

সম্পর্কিত বাংলাদেশে হওয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে বাংলাদেশীদের কী  
মতামত?

প্রশ্নটা খুবই চমৎকার, প্রশ্নের পিছনে আপনার উদ্দেশ্য যাই থাক। অনেক দিন কোরাতে লিখি না। ভাল  
লাগে না। না লাগার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে এই প্রশ্নের পিছনে আপনার উদ্দেশ্যটা। আবার  
আপনার এই প্রশ্নের প্রতিশোধ নিতেও একদল মানুষ মুসলিমদের উপর ভারতীয়দের অত্যাচার নিয়ে  
প্রশ্ন করবে। এভাবেই চোখের বদলে চোখ কেড়ে নেওয়ার সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

হ্যাঁ বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। বলবো না এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার হয় না।  
হয় নিশ্চয়ই হয়। হয়ত আমি দেখি না।  দের আমি যেভাবে সম্মান করি আমি  
ভাবি সেভাবে সবাই করে। কিন্তু সত্ত্ব হচ্ছে  তাদের মতে কিছু আনা ধর্মাবলম্বী ভাইদের মত

▲ 582 | ▾ 0 | ⏴ 13 | ⏵ 0 | ০ 98



110টি উত্তর রয়েছে ও 2.6 লা বার সেগুলি দেখা হয়েছে · 2 বছর

**সম্পর্কিত বাংলাদেশে কেন হিন্দুদের জমি মানুষ দখল করে নেয়?**

বাংলাদেশে প্রভাবশালী রা সুযোগমত সবার জমিই দখল করে নেয়। এক্ষেত্রে কোনও হিন্দু মুসলিম বাচবিচার নেই। হিন্দু বা কোনও সংখ্যালঘু যদি ভিকটিম হন তাহলে সেটা প্রচার মাধ্যমে আসে, হৈচে হয়। এটা একটা ভালো দিক, কারণ এতে ভিকটিমের বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ প্রশাসন তখন একটু নড়েচড়ে বসতে পাখ্য হয়। কিন্তু যদি আপনি দরিদ্র অসহায় কোনও মুসলমান হন আর আপনার জমি কেউ দখল করে নেয় তাহলে আপনি কাকে দুবেন? আপনি না সইতে পারবেন না মরতে পারবেন। আপনার তখন সব গেল তো গেল, বিচার চাওয়ারও সুযোগ নেই। থানা পুলিশ করতে যাবেন? উচ্চে প্রভাবশালীর চেলা চামুণ্ডা  
পড়া চালিয়ে যান ✓ স শাসিয়ে যাবে। আর যিনি আপকর্ম করছেন তার যদি ক্ষমতাবীন দলে

▲ 171 | ▾ 2 | ⏪ 1 | ⏩

ননী  
রোবাংলা এ পাঠক; (2020-বর্তমান) · লেখকের 460টি উত্তর রয়েছে ও 2.8 লা বার সেগুলি দেখা হয়েছে · 11 মাস**সম্পর্কিত বাংলাদেশের হজুররা ওয়াজ মাহফিলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উঙ্কানি কেন দেয়?**

ফেইসবুকে ইউটিউবে বেশ কয়েকটি ওয়াজ মাহফিল দেখেছি। আমার কৌতুহল হল:-

(১) শেষ বিচারের দিন মুত্ত মুসলমানরা জেগে উঠবে এবং বিচার শেষে জন্মত বা জাহানাম যাবে। কিন্তু যারা জীবিত যাদের পেটের ভিতরে অপাচিত খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থ আছে তারা ও বিচার শেষে জীবিত শরীর নিয়ে জন্মতে প্রবেশ করবে। তাহলে ঐ বর্জ্য পদার্থ জন্মতে ফেলে জন্মতকে অপবিত্র করা হবে।

কিন্তু আমরা কেউই চায় না সেটা অপবিত্র হোক। তাই জন্মতে প্রবেশের আগে অবশ্যই মরতে হবে কি না?

কোন আলেম কোন ওয়াজ মাহফিল থেকে এর উত্তর পেলাম না।

(২) জন্মতে আল্লাহ এর সামনে বাইবেল, পড়া চালিয়ে যান ✓ গ্রন্থ পাঠ করা হবে। আর জন্মতি মুসলমানরা আল্লাহ এর সামনে বসে শুনবে।

▲ 19 | ▾ 2 | ⏪ 3 | ⏩

Mohammad Gani  
লেখকের 476টি উত্তর রয়েছে ও 40.4 লা বার সেগুলি দেখা হয়েছে · 1 বছর আপডেট হয়েছে**সম্পর্কিত বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষেরা সব কিছুতে হিন্দু-মুসলমান ভাগ করি কেন?**

এটির আসল উত্তর ছিল: বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষেরা সব কিছুতে হিন্দু-মুসলমান ভাগ করি কেন?

মানুষের নয়, কিন্তু ভিখারীরা এইসব নিয়ে মাতামাতি করে। নিরক্ষর উন্মাদ গেঁয়ো কুকুর গুলি ঘেউ করে। সেসব না শোনাই ভালো।

▲ 171 | ▾ 2 | ⏪ 1 | ⏩ 13

মাহমুদ আলী  
লেখকের 793টি উত্তর রয়েছে ও 48.5 লা বার সেগুলি দেখা হয়েছে · 2 বছর**সম্পর্কিত বাংলাদেশে হিন্দুরা কেন শুধু আওয়ামীলীগকেই সমর্থন করেন?**

বাংলাদেশের হিন্দুরা সবাই আওয়ামী লীগ সাপোর্ট করে না। বিএনপির সাপোর্টারও আছে তবে আওয়ামী লীগ হচ্ছে তাদের আস্থার জায়গা যদিও আওয়ামী লীগের সবাই যে হিন্দু তোষন করে তা না। আওয়ামী লীগ ধর্ম নিরপেক্ষ দল। তাদের নেতারা ব্যক্তিগতভাবে কে কি ধর্মীয় মতের অনুসারী সেটা এখানে বিবেচ্য নয় তবে দল হিসেবে সাংগঠনিক ভাবে তারা ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল।

হিন্দুরা বিএনপিতে যে ভরসা পায় না সেটা আওয়ামী লীগে পায়। আওয়ামী লীগ যখন গঠন করা হয় তখন এর নাম ছিলো আওয়ামী মুসলিম লীগ। পরে সাম্প্রদায়িক চেহারা পাল্টে গন মানুষের দল হতে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়। শুধু হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

পড়া চালিয়ে যান ✓

▲ 160 | ▾ 2 | ⏪ 16 | ⏩





সম্পর্কিত প্রশ্ন

পৃথিবীতে হিন্দু প্রধান দেশ কয়টি আছে এবং কী কী? বিশ্বে হিন্দু জনসংখ্যা কত?

সংস্কৃতি কী? কীভাবে সংস্কৃতি নষ্ট হয়?

সাংস্কৃতিক বিকাশে সমাজকর্মীর ভূমিকা কী?

হিন্দু মতে বিয়ের সময় সাত পাক ঘোরা অনিবার্য কেন?

বাংলাদেশে হিন্দু আর খৃষ্ণনারা কি শুক্রবার মাংস খেতে পারে?

হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কী?

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক আকীকা দেওয়ার নিয়ম কী?

বাংলাদেশ কত দিনে হিন্দু শূন্য হবে?

ইন্দোনেশিয়ান হিন্দুরা আচার ও সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতীয় হিন্দুদের থেকে একদম আলাদা কেন?

হিন্দু ধর্মে কি সিঁদুর দিলে বিয়ে হয়ে যায়?

হেফাজতের কথা মতে বর্তমানে পাঠ্বই থেকে হিন্দু লেখকদের সাহিত্যকর্ম বাদ দেয়া হয়েছে। এই ধর্মান্তর বিরুদ্ধে আপনার অভিমত কী?

সম্প্রতি বাংলাদেশ মেঘনাদ সাহার দ্বারা সংশোধিত বাংলা পঞ্জিকা উন্নয়ন ও গ্রহণ করলেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অথবা হিন্দু ধর্মাবলহীন বিভিন্ন উৎসব উদয়পনে কেন এটি গ্রহণ করেন না?

বাংলাদেশের কোন এলাকাতে হিন্দুদের ঘনবসতি বেশি?

আমার এক হিন্দু বান্ধবী ধর্মান্তরিত না হয়েই মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় আচার-বীতি কিছুই পালন করে না। এখন সে কোন ধর্মের অথবা নিজেকে কি হিন্দু বলে পরিচয় দিতে...

একজন ভারতীয় নাগরিকের জন্য বাংলাদেশে কী কী কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে?

# 'ধর্মের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে বাংলাদেশে'

ঈদের সময় এক খবর সংবাদমাধ্যমগুলো ফলাও করে প্রচার করো খবরটা হলো, হিংগঞ্জে ঈদের জামাতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে ৬০ হিন্দু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এটা কি মোক্ষম দৃষ্টান্ত নয়?



© AP

এই ৬০ জন যুবকের মধ্যে কেউ আইনজীবী, কেউ চিকিৎসক, কেউ বা ছিল ছাত্র। হিংগঞ্জ পূজা উদযাপন পরিষদের বিভাগীয় সম্পাদক শঙ্খ শুভ্র রায় জানান, "আমরা একই শহরে বাস করি। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সবার সাথে মিলে কাজ করতে হয়। তাই শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে তো আমরা নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারবো না।"

এ বিষয়ে স্থানীয় সাংসদ মো. আবু জহির বলেন, "ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি অসাধারণ উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে হিংগঞ্জে। এ উদ্যোগকে সবাই সমর্থন করেছেন। আমরা মুসলমানরাও দুর্গাপূজার সময় অনুরূপ দায়িত্ব পালন করছি।"

বাংলাদেশে দুর্গাপূজার শুরু হয়ে গেছে। আর এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে আরেকটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি হয়েছে যশোরে শহরের লালদিঘি এলাকার পূজামণ্ডপে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখভালের জন্যে ইতোমধ্যে হিন্দু যুবকদের পাশাপাশি মুসলিম যুবকরাও কাজ করছেন। মো. রায়হান সিদ্দিকী ময়নার নেতৃত্বে কাজ করছে ১৭ জন মুসলিম তরুণের একটি স্বেচ্ছাসেবী দল।



ময়নার ভাষায়, "হিন্দু-মুসলিম হচ্ছে ধর্মীয় পরিচয়, কিন্তু আমরা সবাই তো মানুষ। তাছাড়া উৎসব হচ্ছে সর্বজনীন। তাই উৎসবে সবাই শামিল হবে, এটাই যে স্বাভাবিক।"

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপঃকর দাস রতনের কথায়, "আমরা হিন্দু-মুসলিম...সকলে মিলে উৎসব ভাগ করে নিই। আমাদের নিরাপত্তায় মুসলিম যুবকরা এগিয়ে এসেছেন। ভবিষ্যতে আমরা আবারো তাদের পাশে দাঁড়াবো।"

ঠাকার কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরে রমজান মাসে গত ছ'বছর ধরে মুসলমানদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়। রমজাসের প্রতি সন্ধ্যায় প্রায় ৫০০ মানুষ লাইন ধরে ইফতার নেন, যা বিতরণ করেন ভিক্ষুরা। মন্দিরের প্রধান শুঙ্কানন্দ মহাথেরো এটাকে দেখেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার কাজ হিসেবে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় উৎসব

অনেক সংকট আছে। দেশে আছে অনেক দুর্ভিতি, যারা নানা বাহানায়, নানা অজুহাতে ধর্মীয় উৎসবে বিভেদ খোঁজে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায়। তারপরও ওপরের দু'টি উদাহরণই বলে দিচ্ছে, এটাই বাংলাদেশ। এটাই বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা এবং চেতনার মূল সুর।

বাংলাদেশে প্রধান উৎসব এখনো ধর্মীয় উৎসব। এর বাইরে বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। মুসলমানদের প্রধান দু'টি ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল-ফিতর এবং ঈদ উল-আজহা। এর বাইরে মহরমের তাজিয়া মিছিল অন্যতম।

## মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব

ঈদ উল-ফিতর অনেকটাই সর্বজনীন উৎসব। ঈদে পুরনো ঢাকায় যে আনন্দ মিছিল বের হয়, তাতে মুসলামান ছাড়াও সব ধর্মের মানুষ অংশ নেয়। ঐ শোভাযাত্রা অনেকটাই সামাজিক আনন্দ শোভাযাত্রায় পরিণত হয়েছে। ঈদে নতুন পোশাক পরার রেওয়াজ আছে। আসলে বাংলাদেশে একটা নতুন সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে আজকাল। আর তা হলো, ঈদে সময় যাদের সামর্থ থাকে, তা সে যে ধর্মের মানুষই হোক না কেন, নতুন পোশাক কেনার চেষ্টা করো। এছাড়া সব ধর্মের মানুষকে আমন্ত্রণ জাননো হয় খাওয়ার আয়োজনে।

ঈদ উল-আজহায়ও চিত্র মোটামুটি একই। এই যেমন, সামর্থ্বান মুসলমানরা গরুর বাইরে অন্য পশুর মাংসেরও ব্যবস্থা রাখেন অন্য ধর্মের অতিথিদের জন্য।

বাংলাদেশে মহরমের তাজিয়া মিছিলের আয়োজন করে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। এটা কারবালার শোকাবহ স্মৃতিকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়। পুরনো ঢাকার হোসেন দালান এলাকা থেকে সবচেয়ে বড় তাজিয়া মিছিল বের হয়। এ সময়, যার দর্শনার্থী হয় সব ধর্মের মানুষ। মহরম উপলক্ষ্যে মেলা বসে হসেনী দালান, বখশীবাজার, ফরাশগঞ্জ ও আজিমপুরো সেই মেলাও সর্বজনীন।

ঈদ ই-মিলাদুন্নবী বা মহানবীর জন্মদিনেও বাংলাদেশের মুসলমানরা নানা আয়োজন করে থাকে। এর মধ্যে ঢাকায় জসনে জুলুস নামে রং-বেরঙের পতাকার ব্যানারে একটি আকর্ষণীয় মিছিল বের হয়।

## হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয়

দুর্গাপূজা। তবে এই পুজো শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কারণ উৎসবেও অংশ নেয় সব ধর্মের মানুষ। প্রতিমা দেখা, পূজার প্রসাদ খাওয়াসহ সব আয়োজনেই থাকে সবার অংশগ্রহণ। এমনকি প্রতিমা বিজৰ্সনের সময়ও সবাই অংশ নেয়। পূজা উপলক্ষ্যে বসে মেলা, আয়োজন করা হয় নৌকা বাইচের। ঘোরদৌড়েরও আয়োজন হয় কোথাও কোথাও। আয়োজন করা হয় নাটক, যাত্রাপালা এবং গানের আসরে। এই সমস্ত আয়োজন সবাইকে এক করো বলা বাহ্যিক, পূজার উৎসবকে আরো বেশি সর্বজনীন রূপ দেয়। এ সব আয়োজন।

বাংলাদেশে সরবর্তী পূজা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন উৎসবের আমেজ নিয়ে আসো। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসহ স্কুল কলেজের খোলা চতুরে বিদ্যাদেবীর এই পূজাও এক সর্বজনীন আয়োজন। শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে এ আয়োজন সফল করে তোলে। লক্ষ্মী পূজায়ও হিন্দুরা আমন্ত্রণ জানায় সব ধর্মের মানুষকে। ধনের দেবী লক্ষ্মীকে কেউই আসলে অবহেলা করতে চান না। তারপর আসে কালীপূজা, যা সর্বজনীন মন্দপে উদযাপন করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমীর মিছিল আরেকটি আকর্ষণ বাংলাদেশে। এই মিছিলের রঙে সবাই আকৃষ্ট হয়। আর দোল উৎসবে রং খেলায় মেতে গুঠে সব ধর্মের তরুণ-তরুণীরা। এছাড়াও আছে রথযাত্রা, আছে চৈত্র সংক্রান্তি। চৈত্র সংক্রান্তি অবশ্য এখন আবহমান গ্রাম বাংলায় একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পহেলা বৈশাখের আগের দিন, অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে, মেলা বসে গ্রামে গ্রামে।



বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দুদের চড়ক উৎসব নামে আরেকটি ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়। চড়কের সঙ্গে থাকে মেলা। চড়ক এবং মেলা দেখতে সব ধর্মের মানুষই ছুটি যায়।

## বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব

বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব হলো বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা। বুদ্ধদেবের জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধ লাভ, পরিনির্বাণ – সবই বৈশাখী পূর্ণিমায় ঘটেছিল, তাই এ উৎসব বৌদ্ধদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এছাড়া বৌদ্ধদের প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ওড়নোর আকর্ষণ এড়াতে পারে না কোনো ধর্মের মানুষই কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে প্রবারণা পূর্ণিমায় সব ধর্মের মানুষ মিলে ফানসু ওড়ায়া আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রবারণা পালিত হয়। আর এই উৎসব শেষ হওয়ার পর প্রতিটি বৌদ্ধবিহারে পালিত হয় চীবর দান উৎসব।

### ঞিষ্ঠানদের ধর্মীয় উৎসব

ঞিষ্ঠানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ক্রিস্টমাস বা বড়দিন। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই উৎসব এখন বাংলাদেশে সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। তাই গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা, ভোজসভা এবং উপহার বিতরণে সব ধর্মের মানুষই অংশ নেয়। ঢাকার বড় বড় হোটেলে থাকে বড়দিনের বিশেষ আয়োজন।

সাজানো হয় ক্রিসমাস ট্রি, থাকে স্যান্টা ক্লাসও। শিশুরা স্যান্টা ক্লাসের কাছ থেকে উপহার পেতে চায়। বাবা-মা তাদের শিশুদের নিয়ে সেখানে ঘান তাদের আনন্দ দিতো অন্য ধর্মের কেউ কেউ ঘরেও ক্রিসমাস ট্রি সাজানয় এছাড়া ইস্টার সানডেও পালিত হয়। কোথাও কোথাও।

### আদিবাসীদের উৎসব

বাংলাদেশের আদিবাসীরা বাংলা নববর্ষে 'বৈসাবি' নামে একটি উৎসব পালন করে। এটাও সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান তিনটি আদিবাসী সমাজের বর্ষবরণ উৎসব এটি। ত্রিপুরাদের কাছে বৈসুক বা বৈসু, মারমাদের কাছে সাংগ্রাই এবং চাকমা ও তঞ্জঙ্গ্যদের কাছে বিজু নামে পরিচিত। বৈসাবি নাম হয়েছে এই তিনটি উৎসবের প্রথম অক্ষর গুলো নিয়ে। এই বৈসাবি উৎসবে অংশ নিতে সারাদেশ থেকে উৎসাহীয়া ঘান পার্বত্য চট্টগ্রামে।

এছাড়া ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের মর্সিয়া, কাসিয়া, নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দে হিন্দুদের অষ্টমী মান, মৌলভীবাজারের মাধবপুর এবং সুন্দরবনের দুবলারচরে রাশ উৎসব ধর্মীয় সর্বজনীন উৎসবের উদাহরণ।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য হলো ধর্মকে ঘার ঘার জায়গায় রেখে উৎসবকে ভাগাভাগি করে নেওয়া। আমি এবার বাগেরহাটে পূজা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ৬৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ৬০ জনই মুসলমান। প্রতিমা দেখার একটা ঐতিহ্য আছে আমাদের ধর্ম-বর্ণ নিরিশেষে সবাই প্রতিমা দেখছেন। অংশ নিচেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তেমনি মুসলামনদের ধর্মীয় উৎসবেও অংশ নেন সব ধর্মের মানুষ।"

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-ঞিষ্ঠান ঐক্য পরিষদের সভাপতি রানা দাসগুপ্ত ডয়চে ভেলেকে বলেন, "যে ঘার ধর্ম আচারনিষ্ঠভাবে পালন করেনা কিন্তু উৎসব ভাগাভাগি করেন নেনা পূজা অথবা ঈদ-কোরবানি – দু'টোতেই আমরা তা দেখে আসছি। কোনো কোনো গোষ্ঠী মাঝে মাঝে তাদের স্বার্থে এই সম্প্রীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় বা নিয়েছে – এ কথা সত্য। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। কারণ এখানে ধর্মের সঙ্গে হাজার বছরের বাংলি সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে।"

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে শোলাকিয়ার ইমাম মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, "ইবাদত-পূজা আর উৎসব – এ দু'টোকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ইবাদত ও পূজার বাইরে যে উৎসব, তা তো সবারা এটা মানবিকতা। আমরা সব ধর্মের মানুষ, আমাদের উৎসবে পরম্পরকে আপন করে নেবো – এটাই তো ধর্মের শিক্ষা। বাংলাদেশের ঐতিহ্যও তাই কিন্তু কেউ দু'টি বিষয়কে যখন গুলিয়ে ফেলেন, তখনই সমস্য হয়।"

তবে এই তিনজনই মনে করেন, অপশক্তি কখনোই সফল হবে না। বাংলাদেশে ধর্মীয় উৎসবের যে সর্বজনীন ঐতিহ্য, তা ম্লান করা যাবে না। কখনোই।



© Getty Images/AFP/Sh. Alam  
"বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য হলো ধর্মকে ঘার ঘার জায়গায় রেখে উৎসবকে ভাগাভাগি করে নেওয়া।"